www.murchona.com

Jibon Sorol Reka Noy by Moti Nondi

For More Books & Muzic Visit www.MurchOna.com

suman_ahm@yahoo.com

জীবন সরল রেখা নয়

মতি নন্দী

সরলার সংসার খুবই সুখের। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুরা ও প্রতিবেশীরা তাই-ই মনে করে। করার কারণও আছে।

সরলা নিজে দেখতে শুনতে ভাল। মুখের গড়নটি ডিমের মত। গায়ের রঙ কাঁচা হলুদের বা দুধে আলতা, এমনকি পাকা সোনার মত না হলেও গৌরবরণই, তবে ফ্যাকাশে নয়। নাকটা টিকোল হলে মুখের গড়নের সঙ্গে মানাত না, তাই টিকোল নয়। মধ্যিখানটা ঈষৎ বসা। কপালটা ঢালু না হয়ে সামান্য উঁচু হওয়ায় দেখতে ভালই লাগে। চোখ দুটি হরিণের মত নয় বরং লেপচা- ভুটিয়াদের আদলে পেস্তাচেরা। ওর মুখমন্ডলে এই একটিই খুঁত কিন্তু এটিও মানিয়ে গেছে। চিবুক থেকে গলাটা নেমেছে সরু থেকে চওড়া হয়ে ছড়িয়ে পড়া ফুলদানির গলার মত। কাঁধের বিস্তার বাহুতে ঢলে পড়ার সময় চর্বি বা মাংসের অনাবশ্যক ঢিপি তৈরি করেনি। ঝুলে থাকা হাতটা আঙুলের ডগা পর্যন্ত চমৎকার সামঞ্জস্য রেখেছে পাশের দীর্ঘ, মেদহীন দেহকাণ্ডটির সঙ্গে। বক্ষ, কটি ও নিতম্বের সমন্বয়ে ওই দেহটি যে ছন্দ তৈরি করেছে সেটি সে বজায় রেখেছে এবং আজও তাইতে লোকেশ মুগ্ধ রয়েছে, বিবাহের আঠারো বছর পরও। সুতরাং সরলা সুখী।

লোকেশের মত শিক্ষিত, যথেষ্ট সচ্ছল, মিশুক, সুদর্শন এবং মোটামুটি স্বাস্থ্যের স্বামী পেলে সরলা কেনইবা সুখী হবে না? লোকেশ তাকে দেখার জন্য মলিদের বাড়িতে এসেছিল। তার বাল্য বন্ধু মলির অর্থাৎ মালবিকাদের বাড়ি আর সরলার বাপের বাড়ি, সামনে আর পিছনে।

সরলার বাবা ট্রাম কোম্পানীর ক্যাশিয়ার ছিলেন। চার মেয়ে, দুই ছেলের বাবা। ছয়জনের মধ্যে পঞ্চম এবং তৃতীয় কন্যা। তখন কমলা ও রমলা, বড় দুই বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। বাবা দুই ছেলেকে জানিয়ে দিয়েছেন, 'লেখাপড়া শিখিয়ে তোমাদের মানুষ করেছি। দু'জনই চাকরিতে ঢুকেছ। এবার তোমরা বাকি দুই বোনের বিয়ে দাও। আমার যা কিছু ছিল সবই তোমাদের জন্য আর দুই মেয়ের বিয়ে দিতে শেষ হয়ে গেছে।'

সমীর আর অণৎ গভীর প্রকৃতির। তারা স্বীকার করে বাকি দুই বোনের বিয়ের দায় তাদেরই নেয়া উচিত। তারা সরলার জন্য পাত্র খোঁজার চেষ্টা করে বটে, তবে ব্যস্ততা নিয়ে নয়। সরলা তখন একুশ বছরে বিএ দ্বিতীয় বর্ষে পড়ছে। মেয়েদের বিয়ে তো তেইশ-চব্বিশেও হচ্ছে, সুতরাং আরও দু-তিন বছর দেখা যেতে পারে। তাছাড়া তাদের বোন দেখতে তো খারাপ নয়। ডানাকাটা পরী না হলেও, একবার দু'বার ফিরে তাকাতে হয়।

তার বিয়ের কথা ভাবা হচ্ছে সরলা তা জানে।

বন্ধু মলিকে সে বলেছে। মলি তার বাড়ির লোকদের কাছে কথায় কথায় বলেছিল, 'সরির জন্য ছেলে দেখা হচ্ছে। কাকিমা বলল, তোর দাদার সঙ্গে তো অনেকের চেনা, একটু বলিস না, ভাল ছেলের সন্ধান-টন্ধান যদি পায়।'

মলির দাদা মানব রাজনীতিকে তখন দিনের দুই-তৃতীয়াংশ সময় দিয়ে পৌর প্রতিনিধি হবার জন্য নমিনেশন পাবার মত জায়গায় প্রায় এসে গেছে। খুবই ব্যস্ত মানুষ কিন্তু তার মধ্যেই সে লোকেশকে চিহ্নিত করে, বোনের বন্ধু ও পিছনের বাড়ির মেয়ে সরলার জন্য পাত্র হিসেবে। তার সঙ্গে লোকেশ কলেজে পড়েছে, বিএসসি পাস করে বেরোনোর পরও যোগাযোগ আছে।

ওষুধের ডিলারশিপের পৈতৃক ব্যবসায় লোকেশ সাধারণ কর্মচারীর মতনই কাজ করত। ব্যবসার কর্তা ছিলেন

জ্যাঠামশাই। দাম্ভিক রাশভারি অমৃতলাল দত্তই আশি ভাগের মালিক। বছর ছয়েক কাজ করার পর তার সঙ্গে জ্যাঠার খিটিমিটি শুরু হতে থাকে। মনোমালিন্যের বীজ বহু বছর ধরেই দুই পরিবারে বোনা হয়েছিল। লোকেশের ধারণা তার বাবাকে ব্যবসার হিস্যা থেকে ঠকিয়ে জ্যাঠা বঞ্চিত করেছে। রাগ অবশেষে ঝগড়ায় এবং জ্যাঠার কাছে কর্মচারী হয়ে থাকা সম্পর্কটা ঘুচিয়ে ফেলায় পৌঁছায়। তবে মুখ দেখাদেখি বন্ধ হওয়ার মত পর্যায়ে যায়নি। জ্যাঠার পৌত্রের অন্নপ্রাসণের লোকেশ নিমন্ত্রণ খেয়ে এসেছে।

একশো দশ বছরের দর দালান দেয়া বাড়িটা লোকেশের বাবা জীবিত থাকতেই ভাগ হয়ে গেছিল। উঠোনে পাচিল তোলার পর তাদের অংশে পড়েছিল যতটুকু, তাইতে রাস্তার উপর একটা সদর দরজা আর দোতলা ও তিনতলার সিঁড়ি তৈরি করে নিতে হয়। একতলায় একফালি উঠোন, দুটো বৃহদাকার ঘর আর কল-কারখানা। দোতলায়ও দুটি ঘর এবং রাস্তার উপর ছোট বারান্দা। বিটুর আট বছর বয়সে দুটি ঘরকে সে তিনটি করে নিয়েছে। ছেলেকে নিয়ে এক বিছানায় রাত্রে শোওয়া, যখন সবকিছু বুঝতে শেখার বয়স হচ্ছে, অতএব আর উচিৎ নয় বিধায় লোকেশ একটি ঘরকে খণ্ড করে। বিটু তখন থেকেই নিজের ঘরে বাস করছে। বাকি খণ্ডের ঘরটি তার পড়ার এবং বাইরের কেউ এলে বসানোর জন্য ব্যবহৃত হয়।

এই সংসারে সরলা বৌ হয়ে নয়, পা দেয় একেবারে গৃহিণী হয়েই। মা মারা যাবার পর সংসারে আর একমাত্র ব্যক্তি প্রায় অথর্ব বাবার জন্যই লোকেশ নিজের বিয়ের কথা ভেবেছিল। তখন সে হাতে ব্যাগ ঝুলিয়ে ক্লার্ক ট্যাবলেট ওষুধ কোম্পানীর মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ হয়ে ওষুধের দোকানে দোকানে, হাসপাতালে, ডাক্তারদের চেম্বারে ঘুরে বেড়ায়। ঠিকে ঝি এবং তেরো বছরের চন্দন রান্নাসমেত বাড়ির সব কাজ করলেও কোনও কাজের মধ্যে শৃঙ্খলা বা পরিপাট্য ছিল না। লোকেশ বুঝতে পারে ঘরের কাজ মেয়েদের জন্যই অতএব বৌ আনা দরকার।

কিন্তু এনে দেবে কে? তার সঙ্গে একটি মেয়েরও প্রণয় হয়নি। না পাড়ায়, না কলেজে, কোনও মেয়ে তার প্রতি হৃদয় সম্পর্কিত দুর্বলতা দেখায়নি। লোকেশকে এই ব্যাপারটা বহুদিন বিস্মিত রেখেছিল। কবিতা না লিখলেও সে ভাল কথা বলতে পারে, গায়ক বা খেলোয়াড় না হলেও সুদর্শন, তবু একটি মেয়েও তার সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক পাতাতে আগ্রহ দেখায়নি। সে ভেবেছিল, নিশ্চয় তার মধ্যে একটা কোনও গোলমাল রয়েছে, যেজন্য এগোবার বয়সী মেয়েরাও তার দিকে এগোল না।

যাক্ গে, বলে লোকেশ আর এই নিয়ে মাথা ঘামায়নি। প্রেম সবার জন্য নয়, এটা কপালের ব্যাপার এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছে সে জ্যাঠার দেয়া চাকরিতে ঢুকে পড়েছিল। তারপর সে শুধু আর্থিক উন্নতির চেষ্টাই করে গেছে। দিনে ষোল ঘণ্টা পরিশ্রম করে তার নিজের কাজের অন্ধিসন্ধি বুঝতে চেষ্টা করেছে এবং উন্নতিও করেছে।

তার গর্ব সে 'সেল্ফ মেইড ম্যান'। এটা সে প্রায়ই বলে বিশেষ করে বিটুর সামনে। কিন্তু বিয়ের জন্য পাত্রী সংগ্রহে নেমে সে বুঝতে পারে 'সেল্ফ মেইড' কোন কাজে আসছে না। এসব ব্যাপার মা-বাবা কিংবা মাসি-পিসি, কাকী-জ্যাঠিরাই করে থাকেন। মা নেই বা অশক্ত, তাছাড়া ওঁর বোধবুদ্ধির উপরও তার ভরসা নেই। মাসিদের সঙ্গে সম্পর্কটা এমন নয় যে, তাদের বলা যায় 'বিয়ে করব, একটা মেয়ে দেখে দাও।'

পাশের বাড়ির কাউকে অর্থাৎ দুই জ্যাঠির বা জ্যাঠাদের তো বলার কথাই ওঠে না।

তখন এক এক সময় লোকেশের মনে হত, পশ্চিম বাংলা কেন, এই কোলকাতাতেই কয়েক হাজার মেয়ে বর পাবার জন্য দিন গুনে চলেছে আর সে কিনা বউ জোগাড় করতে পারছে না! ওদের আত্মীয়-স্বজনরা যদি একবার জানতে পারত কোলকাতায় নিজের বাড়ি, একমাত্র ছেলে আর বাবার সংসার, শিক্ষিত পাঁচ হাজারের উপর রোজগেরে একটা পাত্র বউ পাবার জন্য কি মুশকিলেই না পড়েছে, তাহলে আঠেরোর এক দুর্গাদাস মিত্র লেনের দরজায় লাইন পড়ে যেত! ভেবেচিন্তে সে ঠিক করল, তার মুশকিলের কথাটা দেশবাসীকে জানাবে। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেবে।

কলেজের সহপাঠী গোবর্ধন ওরফে গোবরা চাকরি করে আনন্দবাজারে, বিজ্ঞাপন বিভাগে। লোকেশ তার সঙ্গে দেখা করতে গেছিল। সে শুনেছে ভিতরে লোক থাকলে বিজ্ঞাপনটা চোখে পড়ার মত ভাল জায়গায় বোরোনার ব্যবস্থা নাকি করা যায়। গোবরার টেবলে পৌঁছে দেখল মানব বসে রয়েছে। ওকে দেখেই লোকেশের মনে

হল, মানবও বিয়ের জন্য বিজ্ঞাপন দিতে এসেছে নাকি?

লোকেশন প্রথমে ইতঃস্তত করেছিল। তারপর গোবরাকে বলেই ফেলে, 'একটা ব্যাপারে তোর একটু সাহায্য চাই। একটা বিয়ের বিজ্ঞাপন দেব।'

'কার বিয়ে?'

'আমারই। বাড়িতে এমন একটা অবস্থা যে, কোন মেয়েছেলে নেই, খুব অসুবিধে হচ্ছে।'

লোকেশের গলায় কৈফিয়ত দেবার সুর স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তার লজ্জাও করছিল। বিজ্ঞাপনের বয়ান লেখা কাগজটা ব্যাগ থেকে বার করছে তখন মানব বলল, 'তুই বিয়ে করবি?'

'হ্যাঁ।'

'পাত্রীর জন্য বিজ্ঞাপন দিতে এসেছিস?'

'হ্যাঁ।'

'দিতে হবে না, আমার হাতে ভাল মেয়ে আছে।'

লোকেশের প্রথমেই মনে হল, মানব বোধহয় নিজের বোনের কথা বলবে। তাহলে তাকে খুবই অস্বস্তিতে পড়তে হবে। কেননা মলি যদিও খুব ভাল মেয়ে কিন্তু বেঁটে এবং বেঢপ। যত প্রয়োজনই থাক লোকেশ ওকে বিয়ে করতে পারবে না। সুতরাং সে কাঠ হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল মানবের পরের কথা শোনার জন্য।

'ছোটবেলা থেকেই দেখছি, মলির খুব বন্ধু, পিছনের বাড়িতে থাকে। বিএ সেকেন্ড ইয়ারে পড়ছে। আমাদের বাড়িতে রোজই আসে। আর বেশ লম্বা, ফর্সাও, মজবুত স্বাস্থ্য। মানব 'বন্ধুগণ' বলে বক্তৃতা শুরু করার আদলে কথাগুলো বলল।

'তা হলে তো ল্যাঠা চুকেই গেল।' গোবরা চোখেমুখে হাঁফ ছেড়ে বাঁচার মত ভাব ফুটিয়ে বলল, 'বাপের অবস্থা কেমন?'

'ভাল নয় খুব। চার মেয়ে দুই ছেলে। বড় ছেলে স্কুল মাস্টারী করে বাইরে, অন্যটি রেলে ঢুকেছে। ভদ্রলোক ট্রামে ক্যাশিয়ার। দুটি মেয়েকে পার করতে গিয়ে হাত খালি হয়ে গেছে।'

'তার মানে কিছু দিতে পারবে না।' গোবরা বরকর্তার ভূমিকা নিয়ে ফেলেছে।

লোকেশ প্রতিবাদ করে ঈষৎ উত্তেজিত স্বরে বলে, 'দিতে পারবেন না মানে? আমি কি ভিখিরি নাকি যে, খাট-বিছানা, ঘড়ি, আংটি, বাসন কোসন কি সোফা, আলমারি, ফ্রিজ, টিভি দিতে বলব?'

'আহা তুই রাগছিস কেন। সমাজে এসব চলে আসছে চলছে বলেই বললুম।' গোবরা কিঞ্চিৎ অপ্রভিত হয়ে গলা নামিয়ে বোঝাল সে ভুল করে ফেলেছে।

'না, না, রাগ করিনি। আমার বাবা জ্যাঠারাও তো বিয়েতে প্রচুর নিয়েছে। দিলে কে আর ছাড়ে। কিন্তু আমি পুরুষ মানুষ, সেল্ফ মেইড ম্যান, এতে আমি কালি লাগতে দেব না। শ্বশুরের দেওয়া খাটে শোব, শ্বশুরের দেওয়া ঘড়ি পরব, অসম্ভব! বৌয়ের শ্রদ্ধাও স্বামীরা চায়, তাই না?'

'তাহলে একটা ঝামেলা চুকে গেল, এবার নেক্সট এবং আসল গাঁট, মেয়ে পছন্দ।' মানবকে অনেকটা নিশ্চিত দেখাল। 'কবে মেয়ে দেখবি বল্, কালকেই?'

'আমি ওই সাজগোজ করানো সামনে ঘাড় হেঁট করে বসে থাকা পুতুল দেখতে রাজি নই। ঘরে রোজ স্বাভাবিক অবস্থায় যেভাবে থাকে, চলাফেরা করে, তেমনভাবে দেখতে চাই।'

'বেশ সেইভাবেই দেখাব।'

বিজ্ঞাপন দেওয়া আর হয়নি। বেরিয়ে আসার সময় গোবরা বলেছিল, 'বিয়েতে নেমন্তন্ন করিস।'

এরপর কফি হাউসে বসে লোকেশ জিজ্ঞাসা করেছিল মানবকে, 'গোবরার কাছে তুই কেন এসেছিলি?'

'ধরাধরির ব্যাপার। একটা ছোট্ট খবর দিয়েছিলাম, আমাদের পাড়ায় রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেছি, চল্লিশজন রক্ত দিয়েছে। দশ দিন হয়ে গেল এখনো বেরোয়নি। তাই গোবরাকে ধরতে এসেছি, ও যদি চীফ রিপোর্টার কি আর কাউকে বলে দু'লাইন বার করতে পারে। বিজ্ঞাপনে থাকলেও ওদিকে তো চেনাজানা থাকতে পারে।'

'এইসব খবর বার হলে তোর কোনও লাভ হয়?'

'হয়। শুধু তো পাবলিকেরই নয়, নেতাদেরও চোখে পড়ে। রাস্তায় রাস্তায় বক্তৃতা করে জীবন শেষ করার জন্য তো আর রাজনীতিতে আসিনি। নিজের ঢাক নিজে না পেটালে কেউ আমার দিকে তাকাবে না। উপরে উঠতে হলে অনেক কিছু করতে হয়। যাগগে এসব কথা, তুই কাল পরশুই চলে আয়।'

'যাব। একটা কথা জানা হয়নি, সোনার বেনে তো?'

'তা নাহলে তোর জন্য বলব কেন! ওরা মল্লিক।'

লোকেশ দু'দিন পর হাজির হয়েছিল। তখন সকাল এগারোটা। মানব বাড়ি ছিল না। মলি বলল, 'তাতে কি হয়েছে, আমিই আপনাকে মেয়ে দেখিয়ে দেব। লুকিয়ে দেখবেন তো ছাদে চলুন আর কাছ থেকে দেখতে চান যদি তাহলে ডেকে আনছি। না না সরিকে কিছু জানাব না।'

প্রথমে দূর থেকে দেখাই ভাল, এক ঝলকেই যদি পছন্দ না হয়, তাহলে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সৌন্দর্য আবিষ্কার করেও কোন লাভ নেই। এই সিদ্ধান্তে এসে লোকেশ ছাদের থেকে দেখাই সমীচীন বোধ করল।

ছাদের একধারে তারে শাড়ি শুকোচ্ছে। লোকেশ তার আড়ালে শুধু চোখ দুটি বার করে দাঁড়াল। মলি অন্যধারের পাচিল থেকে চেঁচিয়ে ডাকতেই উত্তর এল, 'দিদি কলঘরে কাপড় কাচছে।' লোকেশ উঠোনে একটি তরুণীকে দেখতে পেল। অবশ্যই সরলার বোন, না হলে দিদি বলবে কেন!

'খুব দরকার রে অমি, সরিকে একবার উঠোনে আসতে বল নারে।'

কলঘর থেকে সরলা বেরিয়ে এল। দেহে আবরণ বলতে শুধু শাড়িটি। হাঁটুর নিচে জবজবে ভিজে। দু'হাতে সাবানের ফেনা মাখা। তালুর উল্টো পিঠ দিয়ে কপাল থেকে চুল সরাতে সরাতে সে উপরে মুখ তুলল। সায়া, ব্লাউজ, ব্রেসিয়ার ছাড়া পাত্রী দেখার সৌভাগ্য অনেকেরই হয়, তাতে অনেকেই হর্ষ-রোমাঞ্চ বোধ করে, অনেকে মুহূর্তেই বিয়েতে সম্মত হয়ে যায়। লোকেশ নিজের ইন্দ্রিয়সমূহের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার উপর ভরসা রাখতে পারছিল না। চোরাবালির মত ডুবিয়েও তো দিতে পারে।

'সরি, কখন কলেজ যাবিরে, আমার একটা জিনিস তোকে কিনতে দিতাম।'

'কি জিনিস'?

গলা চড়িয়ে বললেও কণ্ঠস্বরটি লোকেশের ভাল লাগল!

'শাড়ির ফলস।'

'সাড়ে বারোটায় বোরোব, তখন নিয়ে নেব।'

সরলা কলঘরে ফিরে গেল। মিনিট খানেকের দর্শন তাতেই লোকেশের কপালে ঘাম দেখা দিয়েছিল।

'আপনি কি কাছে থেকে দেখবেন, তাহলে একটু বসে যান।'

লোকেশ বসেনি, ঘণ্টা দেড়েক দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেছিল বাসস্টপে, সরলাকে দেখার জন্য। সে দেখল চার মিটার দূরত্ব থেকে। সরলা অপেক্ষমাণদের উপর একবার চোখ ফেলেছিল, তাদের মধ্যে লোকেশও ছিল। মিনিট তিনেক পর বাস আসে, ওই সময়টুকুর মধ্যে দু'বার স্থান বদল করে সে সোজা মুখের উপর ও আড়চোখে দেহের উপর চোখ ফেলে সরলার পা থেকে মাথা পর্যন্ত কয়েকবার দ্রুত দেখে নেয়।

এই দেখার সময়ই সে ওই দেহটিতে আসক্ত হতে থাকে। প্রবল একটা আকর্ষণ, যেভাবে গ্রহদের টেনে রেখেছে সূর্য, সরলার দেহও লোকেশকে তার কামনার কক্ষপথে স্থাপন করে সেইভাবে আকর্ষিত করল।

সে সরলার সঙ্গে বাসে উঠল। পুরুষদের জন্য বসার জায়গা নেই। লেডিস সীটে বসা সরলার সামনে সে দাঁড়াল। কিন্তু পূর্ণ দৃষ্টিতে দেখার সুযোগ নিল না। কেননা ইতিমধ্যে সে স্থির করে ফেলেছে, ওই দেহটি আজীবন দখলে রাখার, স্বত্বাধিকারী হওয়ার সুখ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করবে না। তার চেনাজানা লোকদের মধ্যে একজনের বৌয়েরও এমন আকর্ষণীয় গড়ন নেই।

একটা ঘোর তার চেতনায় কুয়াশার মত ছড়িয়ে যাচ্ছিল। ঝাপসা দৃষ্টিতে সে বাসের যাত্রীদের দিকে তাকাল এমন একটা ভাব নিয়ে যেন বলতে চায়, মশাইরা কেমন লাগছে আমার সামনে এই মেয়েটিকে? ও কিন্তু আমার বৌ, আর কিছুদিন পরেই হবে। আমার পছন্দটা কেমন বলুনতো? আমিই এই ফুলটির শোভা দেখব, সুবাস নেব, আপনারা নন। শুধুই আমি।

সরলার পিছু পিছু সে বাস থেকে নেমেছিল। সরলা চলেছে আর এধার সেধার দাঁড়ান কলেজের ছেলেরা তার দিকে তাকাচ্ছে। লোকেশ বাস থেকে নেমে আর এগোয়নি। কলেজের ফটক পর্যন্ত সে চোখ দিয়ে সরলাকে অনুসরণ করতে করতে একটা জ্বলুনি বোধ করল। জীবনে এমন জ্বালানি এই প্রথম। সবাই তাকাচ্ছে ওর দিকে। ঝালমুড়িওলা, চায়ের দোকানের ছোকরাটা পর্যন্ত। কেন? সবাই কি ওকে চায়?

তিন সপ্তাহ পর বিয়ে হয়ে যায়।

সরলার ছোড়দা সনতকে ডাকিয়ে এনে মানব বিয়ের কথা পাড়ে। পাত্র সম্পর্কে যতটুকু জানে সেটা জানিয়ে দিয়ে বলে, 'তোমরাও খোঁজ নাও। তবে এইটুকু বলতে পারি, স্বভাব-চরিত্রে, চেহারায়, বংশ মর্যাদা এমন ছেলে চট্ করে পাবে না। বন্ধু বলেই ভেব না একথা বলছি। সব থেকে বড় সুবিধে কি জান, একেবারে নির্ঝঞ্ঝাট সংসার। আর বিএ পরীক্ষা? সে হয়ে যাবেক্ষণ। প্রচুর বিবাহিতা মেয়ে কলেজে পড়ছে, সরিও পড়বে।

বিয়ের আগে সরলা একবার মাত্র লোকেশকে দেখেছিল। এই দেখিয়ে দেওয়ার কাজটি করেছিল মলি। দেশবন্ধু পার্কের পশ্চিম ফটকে ব্যাগ হাতে লোকেশ অপেক্ষা করেছিল, সরলাকে কলেজ থেকে নিয়ে আসে মলি। যখন দূর থেকে তাকে হেঁটে আসতে দেখল লোকেশ তখন বুকের কাছে টাইটা আঁকড়ে ধরে টানতে থাকে। বিহ্বলতা বা মুগ্ধতা নয়, সে মাথার মধ্যে জ্বলুনি বোধ করছিল। তাকে অপছন্দ করবে এমন অযোগ্য সে নয়, এই ধারণাটা অবশ্য লোকেশের ছিল, কিন্তু ওর কোন প্রেমিকও তো থাকতে পারে। হয়তো সরলা নামক এই ফুলটি অনাঘ্রাত নয়।

লোকেশ ব্যাগটা জমিতে রেখে নমস্কার করে তার সাজানো দাঁতগুলো ঝলসে দিতেই সরলা থতমত হয়ে কোনও রকমে দুই মুঠি বুকের কাছে জড়ো করে। ভাবী স্বামীর সঙ্গে মৌখিক পরিচয় এবং দর্শন করিয়ে দেবে, এই বলেই মলি ওকে এনেছে। সুতরাং আচমকা সাক্ষাৎ নয়। লোকেশের ভ্রূ একবার কুঁচকে উঠেছিল সরলার এই প্রতিক্রিয়ায়। এই রকম সময় বহু মেয়েই নার্ভাস হয় ঠিকই, কিন্তু যদি ওর কোন প্রেমিক থাকে তাহলে এই থতমতনিটাকে নার্ভাসনেস বলা যাবে না। লোকেশ এই রকম চিন্তা মাথায় নিয়ে আবার হেসে বলেছিল, 'আমার নাম লোকেশ দত্ত, এটা নিশ্চয় জানেন। আপনার নামও আমি জানি। চলুন পার্কে কোথাও বসা যাক।'

তারা বেঞ্চে নয়, লোক চলাচল কম অঞ্চল, পার্কের পুবদিকে ঘাসের উপর বসেছিল। এই রকম পরিস্থিতিতে কিভাবে কি বিষয় নিয়ে কে কথাবার্তা শুরু করে প্রাথমিক জড়তাটা কাটিয়ে তুলবে, সেটাই হয়ে ওঠে আসল কাজ। মলি যেহেতু তৃতীয় পক্ষ, সরলার সখি স্থানীয়া, কথা বলতে এবং হাসিতে খুশিতে থাকতে ভালবাসে তাই কাজটা সে-ই নিল।

'আপনারা চুপচাপ কেন, কথা বলুন? যার যা প্রশ্ন করার আছে করুন। আমি বরং একটু ততক্ষণ ঘুরেটুরে বেড়াই।' মলি উঠে পড়ার উদ্যোগ করল।

'না, না, বস।' সরলা হাত টেন ধরল।

‘না কেন?’ মলি ধমকে উঠল। ‘কি সব জিজ্ঞেস করবি বলছিলি কর।’

‘হ্যাঁ করুন না।’ লোকেশ বলল খুবই সহৃদয় ভরসা দিয়ে।

‘বিয়ে হবে কি হবে না, এখনও সেটা পাকা নয়। মানে, এখনও আপনি আমায় অপছন্দ করে বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। সরলার বিব্রত মুখে ঘাম এবং রক্তচাপ দেখা গেল। মুখ নামিয়ে সে ঘাস ছিঁড়ল। মলি ওর কানে কানে বলল, ‘কেমন দেখছিস? পছন্দ হয়েছে?’

‘অসভ্যতা করিস না।’ চাপা গলায় সরলা ধমকায়। ‘তাহলে বলে দিই পছন্দ হয়েছে।’ মলি এবার একটু জোরেই বলল লোকশকে শুনিয়ে। পুলকিত লোকেশ তখন না শোনার ভান করে মুখ ঘুরিয়ে তাকিয়ে রইল দূরের বাড়িগুলোর দিকে।

‘লোকেশ দা, সরি বলছিল’, মলি সেকেন্ড পাঁচেক নীরব থেকে আবার বলল, ‘আপনি কটা ছেলে মেয়ের বাবা হতে চান?’

সরলা হতভম্বের মত দু’জনের দিকে তাকিয়ে তারপর মলির বাহুতে প্রচণ্ড চিমটি কেটে বলে, ‘কি হচ্ছে তোর, এইসব কথা কখন আমি বললুম তোকে?’

‘মাস দুই আগেই তো বলেছিলি।’ মলি এবার লোকেশকে উদ্দেশ করে বলল, ‘ওদের বাসন মাজার ঝি আরতির মার আটটি ছেলেমেয়ে, আবার একটা হবে। সরিই আমাকে বলেছিল– বাবা পারে কি করে! আমি হলে তো মরেই যেতুম। স্বামীটার কি মায়া দয়া নেই? একটা কি দুটোর বেশি কিছুতেই আমি হতে দেব না। তাহলে বলুন আমি কি অন্যায় কিছু জানতে চেয়েছি?’

কথাটা এমন একটা বিষয় নিয়ে লোকেশের তাতে মজাই লাগল। অচেনা তরুণীর সঙ্গে আদিরস ঘেঁষা কথাবার্তায় মন্দ কী, বিশেষত বিয়ে যখন হবেই। লোকেশ বুঝে গেছে সরলার তাকে প্রথম দর্শনেই ভাল লেগেছে।

‘এটা তো জানতে চাওয়া স্বাভাবিকই।’ লোকেশ হালকা চালে সমর্থন করল মলিকে। ‘আমিও তো এই প্রশ্নটাই করতুম, অবশ্য ওনার এ বিষয়ে আলোচনায় আপত্তি থাকতে পারে।’

‘কেন?’ মলির জিজ্ঞাসা।

‘বাহ্, আমিতো সম্পূর্ণ বাইরের লোক। এইসব ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার কথা উনি আমার সঙ্গে কইবেন কেন?’

‘কেন কইবে না? কলেজে পড়ে, টিউশ্যনি করে, ট্রামে বাসে চড়ে, বাইরের লোকদের সঙ্গেও কথা বলার অভ্যাস আছে।’

‘কিন্তু তাদের সঙ্গে ক’টা ছেলেপুলে চান, এই ধরনের কথা কি উনি বলেন?’

‘তারা আর আপনি কি ওর কাছে সমান?’

‘কেন নয়? আমিতো এখনও জানিই না, টোপর পরার অনুমতি পাব কিনা। তারপর তো বাবা হওয়ার প্রশ্ন উঠবে।’ লোকেশ মিটিমিটি হাসতে লাগল সরলার দিকে তাকিয়ে।

‘আপনার পছন্দ হয়েছে সরিকে?’

লোকেশ সোজা সরলার মুখের উপর চোখ রাখল। ঘাড় নিচু করে সরলা ঘাসে হাত বুলাচ্ছিল। হাতটা এবার অনড় হয়ে গেল। উত্তর শোনার জন্য ওর মনপ্রাণ নিবদ্ধ হয়ে রয়েছে বুঝতে পেরে লোকেশ চুপ করে নিঃশব্দ হাসিতে মুখ ঘুরিয়ে ফেলল। সে প্রত্যাশা করছে, উত্তর না পাওয়ার কারণ জানতে সরলা মুখ তুলে একবার তার দিকে তাকাবে। তাকাবেই।

এবং তাকিয়েছিল। এখনো, আঠারো বছর পরেও সেই উভয় উৎকণ্ঠা আর আকুলতা মেশানো সরলার চকিত চাহনিটা ছবির মত তার স্মৃতিতে টাঙ্গানো রয়েছে। অতীতের বহু ঘটনা ধুলো জমে অন্তরালে চলে গেছে। বহু

কথা নীরব হয়ে গেছে। কিন্তু তার দিকে প্রার্থনার মত তাকানো সরলার মুখ, জীবনে সেই প্রথম লোকেশকে ভালবাসায় অবগাহন করিয়ে দেয়।

মলি আবার বলেছিল, 'পছন্দ হয়েছে কিনা বলুন না।'

'তোমায় বলব কেন? যার শোনার, তাকে বলা হয়ে গেছে।' লোকেশ তার গলায় আবেগ ও রহস্য মিশিয়ে ছিল।

বলা হয়ে গেছে! কখন? আমি তো শুনতেই পেলুম না।' মলি অবাকই হয়ে গেছিল। 'এই সরি বলেছে?'

জবাব না দিয়ে সরলা মুখ ঘুরিয়ে ডান কাঁধে থুতনিটা রেখে শুধু হেসেছিল।

'আমার জানতে ইচ্ছে করছে, ওনার পছন্দ হয়েছে কিনা।' কথাটা বলে লোকেশ কৌতুকভাবে সরলার দিকে তাকায়। সেকেন্ড দশেক নৈঃশব্দ বিরাজ করে তিনজনকে ঘিরে। তারপর মুখটা বাঁদিকে ঘুরিয়ে গভীরভাবে লোকেশের চোখে চোখ রেখে সরলা হেসেছিল। বিয়ের পর একদিন কথায় কথায় লোকেশ বলেছিল, 'হাসিটা ছিল অনেকটা মোনালিসার মত। কিছুই বোঝা যায় না।'

কিন্তু লোকেশের সেদিন মনে হয়েছিল শুধু পছন্দই নয় সরলা ইতিমধ্যে ভালও বেসে ফেলেছে। মনে হওয়াটার মধ্যে অবশ্যই বাড়াবাড়ি ঘটে গেছল। কেননা প্রথম দেখার কয়েক মিনিটে মধ্যে ভালবেসে ফেলা একটি সাবালিকার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু তখন লোকেশের মানসিক অবস্থা যেমন হয়ে রয়েছিল তাতে সে ওই রকমই কিছু চেয়েছিল। হয়ত অল্প বয়সে বাংলা ফিল্ম প্রচুর দেখার বা পূজো সংখ্যার উপন্যাস বিস্তর পড়ে ফেলার জন্য তার মধ্যে ভালবাসা বিষয়ে লঘু ধারণা তৈরি হয়েছিল। তবে আটাশ বছর বয়সী উন্নতি অভিলাষী, পরিশ্রমী লোকেশের মত যুবক যদি মনে করে শ্রীময়ী কোন যুবতী তাকে দেখামাত্রই ভালবেসে ফেলবে তাহলে তাকে মাপ করে দিয়ে শুধু বলা যায়, বাপু হে একটু রয়েসয়ে, ভালবাসা ছেলের হাতের মোয়া নয়।

সেদিন লোকেশ মলির সপ্রশ্ন দৃষ্টির জবাবে বলেছিল,

'আমিও উত্তর পেয়ে গেছি।'

'কিভাবে?' মলি উত্তর পাবার জন্য আগ্রহ দেখাল। কিন্তু সে দু'জনের চাহনিও হাসি লক্ষ্য করে বুঝে ফেলেছে, বিয়েটা হচ্ছেই।

লোকেশ অর্থপূর্ণ হেসে প্রসঙ্গ বদলায়। 'বিয়ের পর মেয়েরা লেখাপড়া চালিয়ে গেলে আমার আপত্তি নেই।'

সরলা তখন বলেছিল, 'যদি চাকরি করতে চায়?'

'করবে। তবে স্বামী যদি ভাল আয় করে বাচ্চাকাচ্চা যদি থাকে, তাহলে চাকরির দরকার কি? আমার তো মনে হয়, ঘর সংসারটাই মেয়েদের ভাল করে করা উচিত। ওটাই তো আসল জায়গা, যেখান থেকে সুখ আর দুঃখ তৈরি হয়। তাছাড়া চাকুরে মেয়েদের দেখেছি কেমন যেন নীরস, শুকনো দেখায়, ইমোশ্যন কমে যায়, রোমান্টিক মন আর থাকে না, বাস্তববাদী হয়ে পড়ে। বৌ এমন হয়ে যাক এটা আমি চাইব না।'

'এত মেয়ে চাকরি করছে, সবাই কি এমন হয়ে যায়?'

সরলার মৃদু স্বরের মধ্যে তর্কের ইচ্ছা নেই, ছিল যুক্তির জন্য আবেদন। লোকেশ চুপ করে গেছিল কিছুক্ষণ। তার মনে হয়েছিল, সরলার শুধু মনই নয় একটা মাথাও আছে আর সেটাকে ব্যবহারও করে। তার আরও মনে হয়েছিল, তাদের দু'জনের চিন্তা বহু ব্যাপারে হয়ত মিলবে না।

লোকেশ তখন সরলার জিজ্ঞাসাটা এড়িয়ে হাল্কা গলায় বলেছিল, 'একটা দরকারী কথা জানিয়ে দেবার আছে, আমি জীবনে কখনো কোন মেয়ের সঙ্গে প্রেম করিনি, আমার কোন পেমিকা-ট্রেমিকা নেই।'

কথাটা বলে সে মুখটিপে হাসতে থাকে আর অপেক্ষা করে। এইবার সরলাও তাহলে বলবে– আমারও কোন ছেলের সঙ্গে কখনো প্রেম হয়নি, প্রেমিক-ট্রেমিক নেই। কিন্তু সরলা কিছুই বলল না, একটু হাসল মাত্র। লোকেশ বুঝতে পারছে না, হাসিটাকে সে কিভাবে নেবে। না প্রেমিক নেই, ছিল কিন্তু এখন নেই, আছে কিন্তু

সিরিয়াস কিছু নয়, গভীরই তবে লোকেশের মত স্বামী পেলে ভুলে যেতে রাজি। কিন্তু সে এই একটা ব্যাপারে আপস করতে রাজি নয়, সরলাকে তার যতই ভাল লাগুক না কেন। সে ওর কাছে স্পষ্ট শুনতে চায়, কখনো প্রেম করেছে বা এখনো করছে কিনা? শতকরা একশো ভাগ বিশুদ্ধ টাট্‌কা প্রথম প্রণয়ের শরীক সে হতে চায়।

'কি ব্যাপার, আপনি চুপ করে রইলেন যে?

'কি বলব? একটা মেয়ে স্কুল কলেজে পড়লে, রাস্তা দিয়ে হাঁটাচলা করলে অনেকেই তো তার সঙ্গে কথা বলতে, মিশতে চাইবেই।'

'মিশেছেন?'

'না'

লোকেশ আশ্বস্ত বোধ করলেও মনের মধ্যে একটা অস্বস্তির কাঁটা ফুটে গেল। সত্যি বলল কি? এই ব্যাপারে কখনো কি কেউ সত্যি কথা বলে? এই রকম প্রশ্ন করাটাই তো বোকামি। হাজার হাজার মেয়ে প্রেম করার পর বাপ-মার ধরে দেওয়া পাত্রকে বিয়ে করছে, স্বামীকে সুখী করছে। সুন্দরভাবে ঘর সংসারও করছে। এতে কারুরইতো কোনো ক্ষতি হয় না।

তখন এই সব ভেবেই লোকেশ নিজেকে প্রবোধ দিয়েছিল বা সামলাবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তার চেতনার গভীরে ঘড়ির মত কি যেন একটা টিক্ টিক্ করে চলে আসছে আজ আঠারো বছর, সন্দেহ? ঈর্ষা? অন্য কিছু? লোকেশের মাঝে মাঝে মনে হয়েছে সরলার মত আকর্ষণীয়া দেহের মেয়েকে তার বিয়ে করা উচিত হয়নি। ও যদি মানবের বোন মলির মত বেঁটে বা মোটা হত, একবার দেখেই চোখ ফিরিয়ে নেবার মত মেয়ে হত, তাহলে সে নিশ্চিন্ত হতে পারত, তাহলে মনের অনিশ্চিত এই টিকটিকানিতা বন্ধ থাকত।

আসলে লোকেশ ভয় করে সরলার দেহের মাদকতাকে। সে নিজে যখন মত্ততা বোধ করেছে, তার দৃঢ় ধারণা অন্য পুরুষরাও তাই করবে। তারা চাইবে ওর মন জয় করে দেহটা অধিকার করতে। তা যদি হয় তাহলে সেটা তার পৌরুষত্বের পক্ষে বিরাট হার বলে গণ্য হবে। তার মনে হয়েছিল, এক্ষেত্রে উচিত সরলার মনের চারধারে একটা পাচিল তুলে দেওয়া। ওকে সুখে শান্তিতে স্বস্তিতে রাখলে, ওর ইচ্ছা অনিচ্ছাকে মান্য করলে, আবদার অভিমানকে প্রশ্রয় দিলে এবং হৃদয়ে অধিষ্ঠিত একমাত্র রমণী এই ধারণাটিকে অবিরত ওর কাছে পৌঁছে দিলে পাচিলটা তৈরি হয়ে যাবে। তাতে এমন কোন ছিদ্র থাকবে না যার মধ্য দিয়ে কোন পরপুরুষ গলে আসতে পারবে কিংবা সরলা উঁকিঝুঁকি দিয়ে বাইরে তাকাবার সুযোগ পাবে।

ফল হল এই, আজ আঠারো বছর ধরে সরলা নিজেকে সুখী ছাড়া আর কিছু ভাবার সুযোগ পায়নি। লোকেশ একাগ্র মনে পাচিল তোলার কাজ চালিয়ে গেছে। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুরা ও প্রতিবেশীরা বলে, সরলার সুখের সংসার। সেও বিশ্বাস করে তার সংসারে কোন অপূর্ণতা নেই। একটা মধ্যবিত্ত ঘরের বাঙালি মেয়ের যা কাম্য। তার পাওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু একটা জিনিস সে জানত না, তার স্বামী আঠারো বছর ধরে কাঁটা হয়ে আছে একটা ব্যাপারে, কখন তার স্ত্রী স্খলন ঘটবে।

লোকেশ অপেক্ষা করে আছে, কখন ঘটনাটা ঘটবে। বিয়েটা ধুমধাম করেও হয়নি আবার নমো নমো করেও নয়।

লোকেশের নিমন্ত্রণ তালিকায় প্রথমেই ছিল দুই জ্যাঠামশাই অমৃতলাল ও নৃত্যলালের পরিবারবর্গ। শিবেন্দ্রলাল মাথা, বুক ও পায়ের নানান ব্যাধিতে জীর্ণ শরীর নিয়ে ছেলের বিয়ের নিমন্ত্রণ করতে গেছলেন দাদাদের বাড়িতে। পাশাপাশি সদর। একটাই ছাদ তাতে দুটো পাচিল তুলে তিনটে ভাগ করা। অমৃতলালের বাড়িতে গিয়ে বৌদি, দুই ভাইপো মহাদেব ও সুদেব, তাদের বৌদের এবং যেক'টি নাতি নাতনীকে সামনে পেলেন যথাযোগ্যভাবে বরযাত্রী হবার জন্য ও বৌভাতে আসতে বললেন। নৃত্যলাল চার মেয়ের বাবা। চারজনেরই বিয়ে হয়ে গেছে। বুড়োবুড়ি স্বামী-স্ত্রীর একানে সংসার। ওরা নিমন্ত্রণ পেয়ে খুশি হলেন।

সামনের বাড়িতে তিনঘর ভাড়াটে। বাড়িওলা বঙ্কুবিহারী ছাড়া আর কারু সঙ্গে পরিচয় নেই। শিবেন্দ্র তাকে নিমন্ত্রণ করলেন। দুর্গাদাস মিত্র লেনে বহু ভাড়াটে, তাদের কাউকেই তিনি চেনেন না। সুতরাং নিমন্ত্রণ করার

কথাই ওঠে না। শুধু পুরনো চার-পাঁচ ঘর বাসিন্দাকে পত্র দিয়ে আসেন।

লোকেশ তার অফিসের কয়েকজন ছাড়া আর কাউকে বলেনি। পাড়ায় তার বন্ধুস্থানীয় কেউ নেই। আত্মীয়-স্বজনদের অবশ্য সে নিজে গিয়ে বলে এসেছে। কাজের সূত্রে যেসব দোকানে যেতে হয়, নার্সিংহোমে বা হাসপাতালে ঘুরতে হয় লোকেশ সযত্নে তাদের তালিকা তৈরি করে নিমন্ত্রণ করেছিল। প্রায় দু'শো লোক বৌভাতে খেয়েছে, বরযাত্রী গেছল জনা কুড়ি।

মনোমালিন্য এবং চাপা নিন্দামন্দ যতই দুই বাড়ির মধ্যে থাকুক না কেন, লোকেশের বড় জ্যাঠি বিয়ের আচার অনুষ্ঠানের ভার নিজ হাতে নিয়ে, বরণ করে বৌ ঘরেও তুলেছিলেন এই বলে, 'হাজার হোক লোকুতো দত্ত বংশেরই ছেলে।' তবে বরযাত্রীতে জ্যাঠার বাড়ির বয়স্করা কেউ যায়নি।

নতুন জুতো, জামা আর প্যান্ট পরা চন্দন বরের টোপর হাতে নিয়ে লোকেশের সঙ্গে কনের বাড়িতে গেছল।

'সেলফ মেইড' লোকেশ তার কথা রেখেছিল। শ্বশুর বাড়ি থেকে সে একটি কুটোও নেয়নি। শিবেন্দ্র আটখানি নমস্কারি চাওয়ায় সে বলেছিল, 'এসব সংস্কার বন্ধ হওয়া উচিত। সাধারণ গেরস্ত পরিবার, যদি দুশো করেও এক একটা শাড়ির দাম হয় তাহলে ষোলশো টাকা, এতে ওদের উপর কত চাপ পড়বে তা কি বুঝতে পারছো?'

শিবেন্দ্র অসহায়ভাবে বলেছিলেন, 'লোকু এটা মান-মর্যাদার ব্যাপার। ওরা ভাববে ভিকিরির ঘরে ছেলের বিয়ে দিয়েছি।'

ওরা মানে তার দুই দাদার পরিবার। লোকেশ আটটি তাঁতের শাড়ি কিনে এনে বাবার অথবা শ্বশুর বাড়ির মর্যাদা রক্ষা করেছিল। হাজার দুয়েক এজন্য খরচ হলেও যে আত্মপ্রসাদ সে বোধ করে তারই জের ফুলশয্যায়ও আছড়ে পড়ে?।

'তুমি কি জান, তোমাকে প্রথম কিভাবে দেখেছিলুম?'

'জানি মলি বলেছে।'

'তোমার গায়ে শাড়ি ছাড়া আর কিছু ছিল না।'

' সেই জন্যই পছন্দ হল?'

'এইট্টি পারসেন্ট সেজন্য।'

সরলা তৃপ্ত হয়েছিল কথাটা শুনে। কিছুক্ষণ পর কথায় কথায় লোকেশ বলে, 'পয়সাওলা ঘর থেকে অনেক সম্বন্ধ এসেছিল। অনেক কিছু দেবে বলেছিল।'

মিথ্যা কথাটা কেন যে বলল, লোকেশ পরে ভেবে দেখেছিল। মাথা মুণ্ডু খুঁজে পায়নি। একটি মেয়ের কাছে নিজেকে মহৎ ও বীর করে তোলার জন্য ছেলেরা অনেক কিছু বানায়। কিন্তু এই ধরনের সাজান বীরত্বে তার কোন দরকার আছে কি?

সরলা বলেছিল, 'তাহলে ওখানেই বিয়ে করলে না কেন?' 'তোমাকে দেখার পর আর কাউকে বিয়ে করা যায় কি?' জবাবটা ভালই হয়েছিল, কেননা পুলকিত সরলা তাহলে কোমরে চিমটি কাটত না। নিজেকে আর একধাপ তোলার জন্য তখন লোকেশ বলে, 'আমি সাধারণ এক মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ। পৈতৃক বিষয়-সম্পত্তি বলতে এই বাড়িটা, বয়স একশো পেরিয়ে গেছে। জানালা দরজার অবস্থা দেখে বুঝতে পারছ টাকার অভাবে সারান কি রং কারা হয়নি। তবু এ বিয়ের সব খরচ আমিই করেছি, তোমাদের কাছ থেকে কিছুই নিইনি। এমনকি নমস্কারি শাড়ি পর্যন্ত নয়।'

'জানি।' সরলা কৃতজ্ঞতা জানাতে লোকেশের বুকে মাথা রাখে। 'সবাই বলছে আমার ভাগ্যটা খুব ভাল, নইলে কি এমন স্বামী পায়। আমিও চেয়েছিলাম এমন একজনকে যে খুব উদার হবে, আধুনিক হবে।'

'শুধুই এই?' লোকেশ তার উচ্ছ্বাস দমন করতে গিয়ে শ্বাসকষ্টে পড়ে গেছল।

‘এখন পর্যন্ত এই, তারপর তো আস্তে আস্তে আরও জানতে পারব।’

‘কি কি জানার আছে?’

‘অনেক কিছু। এসব তো টোয়েন্টি পারসেন্ট। বাকি এইট্টি হল আমার মত একটা পাঁচপাঁচি দেখতে মেয়েকে কেমন ভালবাস, কদ্দিন ভালবাস সেটাই।’

‘ভাল শুধু আমিই বাসব আর তুমি শুধু ভালবাসা নেবে, দেবে না?’ সরলা চুপ করে থাকে

‘কি হল, বললে না তো ভালবাসবে কিনা?’

অকস্মাৎ সরলা নিজেকে লোকেশের দেহের উপর তুলে উপুড় হয়ে ছড়িয়ে দিয়ে দুহাতে মুখটি ধরে তীব্র আবেগে তাকে চুমু খেতে শুরু করে। ব্যাপারটা অপ্রত্যাশিত ছিল। লোকেশের কয়েক সেকেন্ড সময় লাগল সরলার কাছ থেকে প্রথম চুম্বন পাওয়ার সুখ অনুভব করার জন্য।

ধীর, আপাত শীতল, নম্র স্বভাবের সরলার এহেন তপ্ত আবেগ তাকে মাদকতা এনে দেয়। কিন্তু চুম্বনের ধরনটিতে কেন জানি তার মনে হল, সরলার এটিই প্রথম চুম্বন নয়। যেভাবে তার মুখ গহ্বরের মধ্যে তার জিভটা ঘুরে বেড়াচ্ছে, যেভাবে ওষ্ঠ ও অধর কামড়ে ধরছে, লোকেশ তাতে অভিজ্ঞতার ছোঁয়া পায়। অন্তত তার তখন মনে হয় প্রথমবারের জড়তা, আড়ষ্টতা এতে নেই।

লোকেশের মাথার মধ্যে টিকটিক করে একটা সন্দেহের কাঁটা ঘুরতে শুরু করা মাত্রই সে থামিয়ে দিয়েছিল। এখন অন্য কোন চিন্তা নয়। একটি সুগঠিত কোমল দেহ তার শরীর ঢেকে ছড়িয়ে রয়েছে, একে যথাযোগ্যভাবে উপভোগ করার জন্য নিজের মধ্যে আবেগ সঞ্চার করান দরকার। কুটিল সন্দেহের ঘড়িটা চালিয়ে রেখে একশো ভাগ সুখ সংগ্রহ করা যায় না। সুতরাং লোকেশ তাদের প্রথম রাতটিকে রমণীয় করার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করে।

দু’সপ্তাহ পর, সরলা তখন সংসার গৃহিণীরূপে অধিষ্ঠ হয়ে গেছে, সকালে তাড়াতাড়ি স্নান সেরে উঠে আসতেই লোকেশ জিজ্ঞাসু চোখে তাকায়।

‘আজ কলেজ যাব।’

লোকেশ ভ্রু কুঁচকে বলে, ‘আর কটা দিন যাক না।’

‘দুপুরে একা একা ভাল লাগছে না। এতদিন কলেজ কামাই করলে–’

‘এত তাড়াহুড়োর কি আছে? বিএ পাস না করলেও কিছু আসে যায় না। চাকরি তো আর করতে হবে না। কয়েকটা দিন বরং চাঁদুর সঙ্গে ক্যারম খেল কিংবা পাড়ার লাইব্রেরীর মেম্বার হয়ে যাও।’

‘বই পড়ে কি সময় কাটে? বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে কথা বলা, ক্লাস করা আর চাঁদুর মতো বোকা নিরেটের সঙ্গে বসে ক্যারম খেলে সময় কাটানো কি এক হল?’

লোকেশ আর কথা না বলে গালে জল মাখিয়ে শেভিং ক্রিম লাগাতে ব্যস্ত হয়। বন্ধু-বান্ধবী না বলে বন্ধু-বান্ধব বলল কেন? একবারের জন্য তার মনে প্রশ্নটা ভেসে উঠেই ডুবে যায়। সঠিক বললে, জোর করেই সে ডুবিয়ে দিল। তখন সে নিজেকে ধিক্কার দিয়ে বলেছিল, একটা বদ অভ্যাস দেখছি আমার মধ্যে তৈরি হচ্ছে। আজেবাজে সন্দেহ করাটা বাতিক হয়ে উঠলে তো জীবনে শান্তি পাওয়া যাবে না! লোকেশের অনুশোচনা প্রকাশ পেল তার কথায়, ‘কলেজ থেকে কিন্তু তাড়াতাড়ি ফিরবে।’

সরলা উদ্ভাসিত মুখে ‘হ্যাঁ ফিরব’ বলেই জানতে চাইল, এ পাড়ায় লাইব্রেরী আছে নাকি? মেম্বার করিয়ে দিও তো।’

‘খুব পুরনো লাইব্রেরী, জ্যাঠামশাইরা যখন স্কুলে পড়ত তখন পাড়ার ক’জন ছেলে মিলে শুরু করে আমাদেরই এই নিচের ঘরটায়। এখন একতলায় রাস্তার উপর সেই ঘরটায় কোচিং চালাচ্ছেন এক স্কুল শিক্ষক। ভাড়া দেন তিনশো টাকা।’

ব্রাশ ঘষে গালে ফেনা তৈরী করতে করতে লোকেশ বলল। 'বাড়ি পার্টিশানের সময় ওটা উঠিয়ে নিয়ে যায় সমাজপতি রোডে, দুলাল স্যাকরার একতলার দুটো ঘরে। তখনই প্রায় হাজার দুয়েক বই। এখন কত হয়েছে কে জানে, হাজার আট-দশ হয়তো হবে।'

'তুমি মেম্বার হওনি কখনো?'

'ছিলুম। স্বপনকুমার পড়তুম। উপন্যাস গল্প ভাল লাগে না, ভ্রমণ কাহিনী পড়তে ভাল লাগে। তোমাকে বিয়েতে কে যেন ইংরিজি একটা বই দিয়েছে, মনে হল সমুদ্রে নৌকায় অভিযানের ব্যাপার নিয়ে লেখা।'

'বইটা ভাল করে দেখিনি এখনো। ইংরেজি পড়তে অসুবিধে হয়, সব কথার মানেও বুঝি না। কে যে দিল। আশি টাকা দাম।'

'কে দিয়েছে' বা হাতটা মাথার উপর দিয়ে ঘুরিয়ে ঝুলপিতে আঙুল চেপে লোকেশ সেফটি রেজারের প্রথম টানটি দিল।

'প্রণব, আমাদের সঙ্গে পড়ে।'

লোকেশ দ্বিতীয় টান দিতে গিয়ে থেমে গেল। 'তোমার বন্ধু'

'হ্যাঁ। ওর সঙ্গে রেখার প্রেম, মাস ছয়েক হল। রেখাও এসেছিল। ও একটা পেতলের অ্যাশট্রে দিয়েছে।'

লোকেশ দ্বিতীয় টান দিয়ে বলল, 'ধরেই নিয়েছে আমি সিগারেট খাই।'

'বাইরের লোকজনের জন্য দরকার হবে।'

'হ্যা। এবার তো একটা বাইরের ঘর দরকার হবে। শঙ্করবাবুকে বলতে হবে কোচিংটা এবার অন্য কোথাও সরিয়ে নেবার ব্যবস্থা করুন।'

'বললেই কি ঘর জোগাড় করতে পারবে?'

'আহা, চেষ্টা শুরু করুক। এখন থেকে করলে ছ'মাসের মধ্যে কি পাবে না? আর মানুষটাও খুব ভদ্র। যাগগে এসব, তুমি দেখ চাঁদুটা রান্নাঘরে কি করছে।'

লোকেশ আঠারো বছর আগে সরলাকে অরুণোদয় পাঠাগারের মেম্বার করে দিয়েছিল, আর সেখানেই তার দেখা হয় তপুর, তপতীর সঙ্গে।

বই, লেখকের নাম ও সংখ্যা লেখা ছাপা ক্যাটালগটা একটা দড়ি দিয়ে কাউন্টারের কাঠের গরাদে বাঁধা। ক্যাটালগ যারা কেনেনি তারা এটা দেখেই বই বাছাই করে রিকুইজিশান স্লিপে লেখে। নতুন বইয়ের নামের তালিকা কাগজে লিখে দেয়ালে সেঁটে দেওয়া হয়। সরলা মুখ তুলে নতুন বইয়ের নাম পড়ছিল। তার পাশে আরও কয়েকজন যাদের সে লক্ষ্য করেনি। তখন প্রায় ফিসফিস করে তার ঠিক পিছনেই একজন বলে ওঠে, 'সরলাদি না।'

সে চমকে পিছনে তাকায়। এ পাড়ায় কে তাকে সরলাদি বলল? কয়েক সেকেন্ড মুখটার দিকে তাকিয়ে সে বলেছিল, 'তপু না?'

সরলা খুবই অবাক হয়ে গেছল। তপু তার বাপের বাড়ির পাড়ার মেয়ে, ছোট বোন অমলার বন্ধু। মাঝে মাঝে তাদের বাড়িতে আসত। তপুর বাবার রেডিমেড জামা কাপড়ের দোকান আছে নিউমার্কেটে। মধ্যবয়সে স্ত্রী মারা যাওয়ার পর আবার বিয়ে করেন। প্রথম পক্ষের এক ছেলেও এক মেয়ে। মেয়েটি তপু। বিয়ের পর বাড়ি বিক্রি করে অন্যত্র কোথায় বাড়ি কিনে তপুরা পাড়া ছেড়ে চলে যায় পাঁচ বছর আগে। সরলা তারপর আর তপুকে দেখেনি। মনেও রাখেনি।

সরলার মনে হল, পাঁচ বছরে তপু বেশ বড় হয়ে গেছে, মুখটা কিছু বদলেছে, বেশ সুন্দরও হয়েছে। ওকে শাড়ি পরা এই প্রথম দেখল।

‘তপু তুই এখানে?’

আমরা তো এখানেই থাকি, সমাজপতি রোডে চব্বিশের বি বাড়িতে। ‘তুমি এখানে?’ বলতে বলতেই তপুর চোখ পড়ল সরলার সিঁথিতে। ‘তোমার বিয়েও হয়ে গেছে!’

‘আমার শ্বশুর বাড়ি দুর্গাদাস মিত্র লেনে, আঠারোর এক।’

অনেক লোক তালিকা দেখতে চাইছে। ওরা দুজনে জায়গা ছেড়ে দিয়ে সরে এল।

‘কবে তোমার বিয়ে হল?’

‘একমাসও হয়নি। তুই আয় না। আমাদের বাড়িতে লোক এত কম যে হাঁফ ধরে যায়। আমরা কর্তা-গিন্নি, শ্বশুর আর একটা কাজের ছেলে। তুই এখন কি করছিস, স্কুলে না কলেজে?’

‘স্কুলে। ইলেভেনে পড়ছি। একটা বছর পড়া বন্ধ ছিল।’

‘কেন?’

‘সে অনেক ব্যাপার। একদিন যাব তোমাদের বাড়ি, আঠারোর এক তো? জামাই বাবুর নাম কি?’

‘লোকেশ দত্ত। এলে বিকেলে আসিস। সকালে খুব ব্যস্ত থাকি, কর্তার অফিস আমার কলেজ, বুড়ো শ্বশুরকে দেখা।’

দুদিন পর তপু এল। পুরনো দিনের গল্প কিছুক্ষণ করার পর সরলা বলল, ‘তোর এক বছর পড়া বন্ধ ছিল বললি, কেন?

‘বাড়ি থেকে বেরোন বন্ধ ছিল বলে।’

‘কেন?’

মায়ের হুকুম। আমি নাকি খারাপ হয়ে গেছি, আমার জন্যে ছোট ভাই-বোনেরা খারাপ হয়ে যাবে, তাই আমাকে ভাল করে বন্দী রাখার ব্যবস্থা হয়।

‘কি করেছিলি?’

‘প্রেম।’ তপু স্বচ্ছন্দে বলল সরলার চোখে চোখ রেখে। বরং সরলাই অস্বস্তিতে পড়ল। হাজার হোক সে ওর বন্ধুর দিদি, এসব কথা মুখের উপর বলাটা অশোভন। মনে মনে ক্ষুণ্ন হলেও সে কৌতূহল ধরে রাখতে পারল না।

‘কে?’

‘একটা ছেলে ছাড়া আবার কে?’ তপু ঝরঝর হেসে উঠল।

চা নিয়ে এল চাঁদু। হাফ প্যান্ট আর বুশ শার্ট পরা, গৌরবর্ণ সুদর্শন কিশোরটির দিকে কৌতূকভরে তাকিয়ে তপু বলল, ‘আমি নিচে জিজ্ঞেস করলুম এখানে লোকেশ দত্ত থাকেন? ও খুব গম্ভীর মুখে বলল, হ্যাঁ, আপনার কি দরকার তাকে? বললুম, তার বউ-এর সঙ্গে দরকার। বলল, ‘বৌদি কলেজ থেকে এসে বিশ্রাম নিচ্ছেন। বললুম ‘শুয়ে আছেন?’ বলল, ‘না পাশের বাড়ির বৌয়ের সঙ্গে গল্প করছেন জানলায় দাঁড়িয়ে।’

‘বোঝ সরলাদি এই হল তোমার বিশ্রাম নেওয়া। আমার এত হাসি পেল জ্যাঠামশাই-এর মত ওর বলার ধরনে।’ সরলাও হাসল। ‘চাঁদু বয়সের তুলনায় একটু পাকা, তাই নারে চাঁদু।’

মুখ গম্ভীর করে চাঁদু বলল, ‘দাদুর জন্যে খই আনতে হবে, পয়সা দাও।’

সরলা হাতব্যাগ থেকে ওকে টাকা দিল। যাবার সময় বিরক্ত চোখে চাঁদু তার দিকে তাকিয়ে বলে, ‘গল্প করাটা বিশ্রাম নাতো কি?’

জোরে হেসে উঠে তপু বলেছিল, 'সরলাদি ওকে প্রথম দেখে মনে করেছিলুম তোমার দ্যাওর ট্যাওর হবে। ভদ্দর লোকের ছেলের মতই দেখতে। পেলে কোত্থেকে?'

'তোর জামাইবাবুই যোগাড় করেছে, এসেছে মাস ছয়েক, তারকেশ্বরের দিকে বাড়ি, দুশো টাকা মাইনে। আমার সঙ্গেও জ্যাঠামো করে কথা বলে, তবে একদমই গবেট, মাথায় বুদ্ধি বলে কিসসু নেই।'

'একদিক থেকে ভালই, চালাক-চতুর হলে তো এতদিন থাকত না।'

'খাওয়ার লোভ নেই, টাকা কড়ির ব্যাপারেও হাতটান নেই।'

'এতো সোনায় সোহাগা। একটু তোয়াজে রেখ।'

'তোর জামাইবাবুও এই কথা বলে। কি যে তোয়াজ করব আমি তো ভেবে পাই না। এই পাশের বাড়ির বৌ রঞ্জনা, বছর তিন বিয়ে হয়েছে, একটা বাচ্চা, বলছিল একটা দিনরাতের ঝি দেখে দিতে। যে ছিল সে বেশি মাইনেতে কাজ পেয়ে চলে গেছে। তবে শাশুড়ি ননদরা আছে বলে অসুবিধে হচ্ছে না।'

'তোমার কি অসুবিধে হবে।'

সরলার লাজুক হাসি যোগ দিল তপুর মিটমিট চোখের সঙ্গে। 'আমার এখন ওসব হবে টবে না। অন্তত বিএ পরীক্ষার আগে তো নয়ই।'

'পিল খাচ্ছ?'

সরলা থতমত এবং ক্ষুণ্ন হল। তপু তার বয়স এবং সম্পর্কের এলাকার বাইরে এসে সখীর মতো হতে চাইছে। মলিকে তার মনে পড়ল। এসব কথা ওর সঙ্গেই বলা যায় কিন্তু মলি আসব বলে একদিনও আসেনি।

তপুর প্রশ্নটা এড়াবার জন্য সে বলল, 'কাল কেক কিনে এনেছে। দাঁড়া তোকে দিই।'

তাড়াতাড়ি সরলা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। লোকেশ, শ্বশুর চাঁদু, কলেজ আর সংসার চব্বিশ ঘণ্টা ভরিয়ে রাখার পক্ষে যথেষ্ট। তাহলেও অনেকগুলো ফাঁক থেকে যায়। রঞ্জনা বাইরে থেকে মাত্র তিন বছর বৌ হয়ে এই পাড়ায় এলেও বহু বাড়ির হাঁড়ির এবং শোবার ঘরের খবর রাখে। সে একটা ফাঁক ভরাট করে দেয়। কিন্তু ওর কাছে মন খুলে নিজের প্রাণের খবর দেওয়া যায় না। দিলেই পাড়ায় চাউর হয়ে যাবে। কিন্তু মলির সঙ্গে সব কথা বলা যায়।

কেক-এর প্লেট তপুর হাতে দিয়ে সরলা বলে, 'তোরা তো এক ভাই এক বোন?'

'ছিলাম। এখন আরও দুই এবং এটার সঙ্গে আরও যোগ হবে। আমার এই সৎমাটি একখানা চিজ্। ফিল্মে যেরকম সৎমা দেখা যায় ইনি ঠিক তাই। দাদাকে আর আমাকে যত রকমে পারে হেনস্থা করে। আমরা বাইরের লোকের মত বাড়িতে থাকি। খাওয়া পরার মত ছোট-খাট তুচ্ছ ব্যাপারেও এত নীচতা দেখায় যে, ইচ্ছে করে বাড়ি ছেড়ে কোথাও চলে যাই।

'বাবাকে বলিস না?'

'হুঁ উ উ। আমার সৎমার বয়স এখন তিরিশ, একটা গতরও আছে। তোমার মতই সেক্সি।'

সরলা সন্ত্রস্ত বোধ করল। এমন কথা লোকেশের মুখে শুনলে একরকম লাগে কিন্তু তপুর মুখ থেকে বেরোলে একদমই রোমাঞ্চ লাগবে না।

'গতরটা তিনি সারাদিন খাটান সংসারে, আর রাতে বাবার কাছে।' তপুর মুখভাব বদলে গেছে। অনেক দিনের জমান ক্রোধ বার করার চেষ্টায় মুখে হিংস্রতা ফুটে উঠেছে।

'বাবা সম্পর্কে এভাবে বলতে নেই তপু।'

'খুব আছে। আমাকে বলে কিনা নোংরা চরিত্রের? আমি প্রেম করেছি তো কারুর ক্ষতি করে নয়? বাচ্চা বাচ্চা

ভাই বোনেরা নাকি খারাপ হয়ে যাবে, কি বোঝে ওরা? বাবা যেমন অশিক্ষিত, আনকালচার্ড, তার থেকেও বেশি এই মেয়ে মানুষটা। ক অক্ষর গোমাংস, বাপটা মুদির দোকানে কাজ করে। জানো সরলাদি বাবাকে দিয়ে আমাকে মার খাইয়েছে।'

'স্কুল পড়া বন্ধ করে দিয়েছিল?'

'হ্যাঁ' শেষকালে দাদার সঙ্গে বাবার কথা হয়। সম্পত্তির অংশ আমাদের দেবে না তবে দাদাকে একটা দোকান করে আলাদা করে দেবে আর আমার বিয়ের খরচ দেবে। ওই বাড়ির সঙ্গে আমাদের দুজনের চিরকালের মতো কোনও সম্পর্ক থাকবে না। দাদাও বলে, তপুকে স্কুলে পড়তে দিতে হবে, বাড়ির বাইরে যেতে দিতে হবে। আমিও লিখে দিয়েছি, হ্যাঁ লিখে দিয়েছি কখনো কোন ছেলের সঙ্গে মিশবো না যতদিন বাবার বাড়িতে থাকব।'

তপুর কথাগুলো শেষের দিকে মন্থর ও ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। সরলা দেখল ওর দু'চোখে জল টলটল করছে। 'তা সেই ছেলেটি এখন কি বলছে? তুই ওকেই বিয়ে করবি তো? বয়স কত, কি করে?'

তপু নিঃশব্দে হাসতে শুরু করল। 'সরলাদি তুমি সত্যিই সরলা। স্কুলের দু'তিন জনের কাছে শুনলাম, সে এখন একটা মেয়ের সঙ্গে ঘুরছে। কয়েক মাস আমায় দেখেনি তো! বিএ পাস, রেডিওয় রবীন্দ্র সংগীত গায়, দেখতে ভালই তাই প্রেমে পড়েছিলুম। মাধ্যমিকে কোন রকমে সেকেন্ড ডিভিশন হয়েছে তবে এখন আমি পড়াশোনায় মন দিয়েছি। এমএ পাস করতেই হবে।'

'তোর কথা শুনে প্রথমে মনেই হচ্ছিল না যে, তুই এত সিরিয়াস।'

'তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছিল আমাকে তুমি অন্য কিছু ধরে নিয়েছ, বাজে টাইপের, তাই না?'

সরলা হেসেছিল, অকপটেই সে বলে, 'তুই অমুর বন্ধু তো তাই পিল টিল নিয়ে তোর সঙ্গে কথা বলাটা উচিত মনে হয়নি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে তুই অনেক ম্যাচিওরড। তুই যদি রোজ আসিস আমার ভাল লাগবে। ওর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব, দেখবি তোরও খুব ভাল লাগবে। ও খুব উদার আর মডার্ন।

সেদিন রাতে সরলা খেতে খেতে লোকেশকে তপুর কথা বলেছিল। লোকেশ মন্তব্য করেছিল, 'বার্থ কন্ট্রোলের মত ব্যাপারগুলো খুবই পার্সোনাল, প্রাইভেট। এসব নিয়ে বাইরের লোকের সঙ্গে আলোচনা কেউ করে না।'

সরলা অপ্রতিভ হয়ে যায়। বলে, আমি অবশ্য কিছুই বলিনি। শুধু বলেছি, বিএ পাস করার আগে জনসংখ্যা বৃদ্ধি করব না।'

লোকেশ পাতলা হেসে বলেছিল, 'মনে থাকে যেন।'

এর তিন মাস পরেই সরলা জানল সে সন্তান-সম্ভবা। ভয়ে সে সিঁটিয়েছিল কয়েক দিন। লোকেশকে খবরটা জানাতে ভরসা পায়নি। সে হিসেবে করে দেখেছে, বিএ ফাইনাল পরীক্ষার পাঁচ মাস আগে তাকে মা হতে হবে। পরীক্ষার জন্য তৈরীই বা হবে কি করে? কলেজ যাওয়াও তো বন্ধ করতে হবে শেষের কয়েকটা মাস। বাচ্চা সামলে পড়ার কাজ তখন নানা ঝামেলায় করে ওঠা যাবে না। ফেল করতেই হবে। এর থেকে লজ্জার আর কি হতে পারে। পাশের রঞ্জনাদের বা জ্যাঠামশাইয়ের বাড়িতে তার কলেজ যাওয়া নিয়ে যে ঠোঁট বেঁকিয়ে কথাবার্তা হয় সেটা তার কানে এসেছে ঠিকে ঝি বাসনা মারফৎ। এই পাড়ায় কলেজে যাওয়া বৌ একজনও নেই।

সরলা খুবই মুষড়ে পড়েছিল। ভুলটা নিশ্চয় তারই। প্রত্যেক সন্ধ্যায় সে বড়ি খায়। নিশ্চয় কোনদিন সে ভুলে গেছল। তার মনে হল, যেদিন অ্যাকাডেমিতে থিয়েটার দেখতে যাবার জন্য তাড়াহুড়ো করে বিকেলে বেরিয়েছিল সেই দিন খাওয়া হয়নি। এই ভুলের কথা শুনলে লোকেশ যে কি প্রচণ্ড রাগবে।

সে তপুকে বলে, 'তোর চেনাজানা কোন ডাক্তার আছে, লেডি ডাক্তার?'

'কেন কি হয়েছে তোমার?'

'একবার দেখাতাম। কি রকম যেন লাগছে। মনে হচ্ছে...।'

তপুর উদ্বিগ্ন মুখে অতঃপর হাসি ছড়িয়ে পড়ে।

ফিসফিস করে বলে, 'নতুন মানুষ আসার গ্রিন সিগন্যাল পেয়েছো?'

'ঠাট্টা করিস না, আমার অনেক কিছু নির্ভর করছে এর উপর। এখন আমার বাচ্চা হলে খুব ক্ষতি হবে। তোর জামাই বাবু তো চায়ই না, আমিও চাই না। আছে তোর জানাশোনা কেউ?'

'কি করবে? অ্যাবোর্শন?'

শব্দটা ধাক্কা দিয়েছিল সরলাকে। কেমন একটা অনৈতিক অপরাধের ছোপ লাগান রয়েছে।

জন্ম থেকেই সে শুনে এসেছে ঃ এসব কাজ যারা করে তাদের চরিত্রের ঠিক নেই। ভদ্দর ঘরের মেয়েরা পেট খসায় না। কিন্তু যে বিড়ম্বনায় এখন সে পড়েছে তাই থেকে রেহাই পেতে হলে আর কি পথ খোলা আছে?

'আর কি করতে পারি?'

'দরকার কি? হোক না বাচ্চা।' তপুর স্বরে প্রচ্ছন্ন মিনতি ছিল।

'না, না, এখন এসব নয়। আমার বিএ পরীক্ষা তাহলে আর দেওয়া হবে না। একবার ড্রপ করলে জীবনে আর আমার বিএ পাস করা হবে না। দেখ নারে তোর কেউ চেনা ডাক্তার আছে কিনা।'

'জামাইবাবুকেই বল না।'

'ওরে বাবা, শুনলে নির্ঘাৎ ক্ষেপে উঠবে। আমার ভুলেই তো হয়েছে, কাউকে আমি এ ব্যাপারে বলতে পারব না। তোকে বিশ্বাস করি, তুই আর কাউকে বলবি না তাও জানি।'

'সরলাদি আমার জানাশোনা ডাক্তার তো কেউ নেই তবে খোঁজ নেব। গাইনি কিনা জানি না, এক ডাক্তারের মেয়ে আমাদের সঙ্গে পড়ে কিন্তু তাকে তো কথাটা খুলে বলতেই হবে। অবশ্য ওরা থাকে বেলগাছিয়ায়, এখান থেকে অনেক দূরে।'

'তোর জামাইবাবুর অনেক ডাক্তারের সঙ্গেই চেনা আছে, যদি এর সঙ্গেও চেনা থাকে?'

'অত ভাবলে চলে না। দাঁড়াও আগে আমি মেয়েটাকে বলে দেখি, এত ব্যস্ত হবার কি আছে? তুমি যা ভাবছ তাতো নাও হতে পারে, এ রকম ভুল শুনেছি অনেক ক্ষেত্রে ঘটেছে।'

তিন দিন পর তপু খবর নিয়ে এল। এই তিন দিন সরলা কাঁটা হয়ে কাটিয়েছে। তার জীবনে এমন সঙ্কট এই প্রথম।

'বিকেল পাঁচটা থেকে সাতটা পর্যন্ত বসেন শ্যামবাজারে, সুদর্শন মেডিক্যাল হল নামে একটা ওষুধের দোকানে। গাইনিকলজিস্টই, ষাট টাকা ফী। তারপর যান বরানগরে, সেখানে সাড়ে সাতটা থেকে...'

'দরকার নেই বরানগর। তুই কিন্তু আমার সঙ্গে যাবি, যাবি তো?' কাকুতি জানাল তপুর হাত ধরে।

'যাব, আমি কিন্তু বলেছি তুমি আমার বৌদি।'

'ভাল করেছিস, নামটাও অন্য কিছু বলতে হবে।'

'শান্তিসুধা... আমার সৎমায়ের নাম।' বলেই তপু জোরে হেসে ওঠে। 'ওরও বাচ্চা হবে।'

সরলা পরদিন পাঁচটার আগেই কলেজ থেকে বেরিয়ে সুদর্শন মেডিক্যাল হলের সামনে দাঁড়িয়েছিল। বুক ঢিবঢিব অবশ্যই করছিল, যদি লোকেশ ট্রামে বা বাসে এখান দিয়ে যেতে যেতে তাকে দেখে ফ্যালে? একটা মিথ্যা কিছু বানাবার চেষ্টা করছিল তখনই তপু স্কুল থেকে এসে পড়ে।

ভিড় ছিল কিন্তু ডাক্তার বাবু সরলাকেই আগে ডেকে নেন। সৌম দর্শন, প্রৌঢ়, ছিপছিপে দুই চোখে হাসি, সরলার ভরসা জেগেছিল দেখামাত্র।

‘আমার মেয়ের কাছে কিছুটা শুনেছি, কিন্তু মা তুমি অ্যাবোর্শন চাইছ কেন সেটা আমার কাছে খুব পরিষ্কার নয়। পরীক্ষা দিতে অসুবিধে হবে? ডাক্তার বাবুকে চিন্তিত দেখাল। যেন সমস্যাটা তারই। সরলা এবং তপু যেসব যুক্তি দিয়েছিল ডাক্তারবাবু শুনতে শুনতে মাথা নাড়ছিলেন। ‘না মা, এগুলো কোন কথা নয়। এত ভাল স্বাস্থ্য, বাচ্চার মা হবার পক্ষে আদর্শ বয়েস, টাকা কড়িরও অভাব নেই। স্বামীকে বুঝিয়ে বলো। কি করেন উনি?’

সরলার আগেই তপু বলে ওঠে, ‘এঞ্জিনিয়ার। দাদা দুর্গাপুরে চাকরি করেন।’

‘শিক্ষিত, নিশ্চয় বুঝবেন। তুমি বরং ওকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলো।’

‘বলব’ সরলা মাথা নামিয়ে বলেছিল। ‘তোমরা মা হতে এত অনিচ্ছুক হও কেন? লেখাপড়ার জন্য তো সারাজীবনই পড়ে রয়েছে। এখন তাজা শরীর, তাজা মন, ছেলেমেয়েকে গড়ে তোলার জন্য এটাইতো বয়স।’ কথাগুলো বলার সঙ্গে সঙ্গে তার নাম লেখা প্যাডের কাগজে খসখস করে কি সব লিখছিলেন। ‘তোমার নাম?’

তপু কিছু বলার আগেই সরলা বলল, ‘আমার নাম সরলা দত্ত।’ তপু ক্ষণিকের জন্য অবাক হয়ে, মাথা হেলিয়ে অনুমোদন জানায়।

এরপর ডাক্তারবাবু কাগজটা হাতে নিয়ে বলেছিলেন, ইউরিন পরীক্ষা রিপোর্টটা তাকে দেখাতে। তিনি ফী নিতে অস্বীকার করেন।

ফিরে আসার সময় তপু বলে, ‘ডাক্তার বাবুর সঙ্গে আমি কিন্তু একমত।’

সরলা কথা বলেনি। তার মনে হচ্ছিল, জীবনের একটা অধ্যায় আজ শেষ হল। বিয়ের দিনও যা মনে হয়নি আজ সেটাই মনে হল, বৌ হওয়ার চেয়ে মা হওয়া অনেক বড় ব্যাপার। বড় হওয়াই তার পছন্দ।

সেদিন রাতেই সে লোকেশকে জানিয়ে দিল। অবাক হয়ে কয়েক সেকেন্ড সরলার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে নিচু গলায় সে বলে, ‘তুমি নিজের পায়ে নিজে কুড়োল মারলে। আমার কিছু বলার নেই।’

‘একসটার্নাল হয়ে পরীক্ষা দেবার চেষ্টা করব।’

‘দেখ।’

সরলার মনে হল, এখন থেকে তাদের মধ্যে আগের সম্পর্কটা বোধ হয় থাকবে না। লোকেশ যদি এমন ঠাণ্ডা মেজাজে, বিরক্ত না হয়ে ব্যাপারটা গ্রহণ না করত তাহলে সে স্বস্তি পেত।

‘তুমি যদি না চাও তাহলে কোন নার্সিং হোমে ব্যবস্থা করে তো চুকিয়ে ফেলা যায়।’

খাটে আধশোয়া লোকেশ খবরের কাগজটা চোখের সামনে তুলে পড়তে শুরু করে। সরলাকে উত্তর দেয়নি। তার মন এখন হালকা, ভারমুক্ত, শিথিল। সরলার কলেজ যাওয়া বন্ধ হবে, এটাই তাকে প্রসন্নতায় ভরিয়ে দেয়। সে কখনোই চায়নি তার বৌ একা বাইরে যাক এবং অজস্র পুরুষের চোখের দ্বারা ধর্ষিতা হয়ে ফিরে আসুক। যা দিনকাল পড়েছে, কে বলতে পারে সত্যি সত্যি তা ঘটে যাবে না?

খবরের কাগজটা নামিয়ে সে দেখল, সরলা ছলছল চোখে তার দিকে তাকিয়ে পায়ের কাছে বসে রয়েছে। সে হেসে, ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে সরলাকে বুকের কাছে টেনে এনে বলল, ‘এসে পড়েছেই যখন তাহলে আসুক। ফিরিয়ে দিলেও তো পরে আবার আসবে।’ মিনিট দুই পরে সরলা বলল, দরজাটা আগে বন্ধ করে দাও।

লোকেশ উঠতে যেয়ে দেখল দরজায় চাঁদু দাঁড়িয়ে। এইমাত্র এসে পড়েছে বলে তার মনে হল না। নিশ্চয়ই এতক্ষণ ধরে দেখছিল। সরলার উরু থেকে সায়া নামিয়ে দিতে লোকেশের মাথায় রক্ত চড়ে গেল। দ্রুত এগিয়ে গেল এবং চাঁদুর গালে প্রচণ্ড চড় কষাল। টলে গিয়ে চাঁদু দেয়ালে ধাক্কা খেল। ‘হারামজাদা।’ দাঁত চেপে লোকেশ বলল এবং দরজার পাল্লা সশব্দে ভেজিয়ে দিল। ‘দিল মেজাজটা নষ্ট করে।’

‘অত জোরে মারলে।’ সরলা খাটে উঠে বসল। ‘মুখ ফাটিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। অতবড় দামড়া তেরো-চৌদ্দ বছরের ছেলে তার কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিনা দেখছে। একটা সাধারণ বোধবুদ্ধির ব্যাপার।’

‘ওর বুদ্ধিটা খুবই কম।’

‘থাক ওর হয়ে আর তোমায় কিছু বলতে হবে না। আমি অনেক দিন দেখেছি তুমি আমি ঘরে থাকলেই নানা ছুঁতোয় ও ঘরে চলে আসে। লক্ষ্য করেছ ও তোমাকে কিভাবে দেখে? বয়সটা খারাপ, মেয়েদের এ্যানাটমি দেখার আগ্রহ তো এই বয়সেই শুরু হয়।’ ‘তাই বলে এইভাবে মারবে? বুঝিয়ে বলতে পারতে।’

‘এইভাবে ওদের বোঝাতে হয়। যাদের যা দাওয়াই তাই দেওয়া উচিত।’

‘এখন যদি ও কাজ ছেড়ে চলে যায়?’

লোকেশ কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল। তার রাগ অন্ধত্ব ত্যাগ করে ধীরে ধীরে স্বচ্ছ দৃষ্টি ফিরে পাচ্ছে। চাঁদুর মতো কাজের ছেলে যদি চলে যায় তাহলে সংসারে তো বিশৃঙ্খলা তৈরী হবেই তার এবং সরলারও খাটুনি বাড়বে। নানান মানসিক চাপ আসবে, আরাম ও শান্তি নষ্ট হবে। ঝি বা চাকর টাকা ফেললেই মেলে না। এটা স্রেফ বরাতের উপর নির্ভর করে। চাঁদুকে সে বরাত জোরেই পেয়ে গেছল।

‘যাবে কোথায় এমন সুখের চাকরি ছেড়ে দিয়ে?’

লোকেশের গলার স্বরে কিন্তু প্রত্যয় নেই। সে বুঝে গেছে চড় মারাটা ভুল হয়েছে।

‘ও হেসে খেলে যে কোন মাড়োয়ারির বাড়িতে পাঁচশো টাকা পাবে। ভাংচি দিয়ে ভাগিয়ে নেবার লোকের তো অভাব নেই। তখন তো আমাকেই কাপড় কাচা, রান্না করা আর দোকানে যাওয়ার কাজগুলো করতে হবে।’ সরলা বিরক্তি দেখাতে কার্পণ্য করেনি।

লোকেশ ঘর থেকে নীরবে বেরিয়ে চাঁদুকে দোতলায় খুঁজে একতলায় গেল। রান্নাঘরে রুটি বেলছিল। মুখ তুলে লোকেশের দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল। চোখে আশঙ্কা।

‘উঠে আয়’।

কুণ্ঠিতভাবে চাঁদু উঠে দাঁড়াল। লোকেশ এই প্রথম কাছের থেকে ওর মুখ খুঁটিয়ে নজর করল। রীতিমত অকর্ষণীয় চোখ, নাক, কপাল, ঠোঁট। প্রকৃত হ্যান্ডসাম, সিনেমার হিরো হতে পারবে বারো চৌদ্দ বছর পর। ওর বুদ্ধি শুদ্ধি যে মোটা দাগের, মুখে কিন্তু তার কোন প্রতিফলন নেই। গালে লালচে ছোপ পড়ে গেছে।

লোকেশ আলতো আঙুল চাঁদুর গালে বুলিয়ে স্নেহমাখা স্বরে বলল, ‘খুব লেগেছে?’

‘না।’

‘না কি? আমার হাত জ্বলছে আর বলছিস লাগেনি? আসলে হয়েছে কি...।’ লোকেশ আড়ষ্ট হয়ে পড়ল। কেন চড়টা মেরেছে, সেটা ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হলে চাঁদুকে যা বলতে হয় সেটা তাকে লজ্জায় ফেলে দিল।

চাঁদুকে বুকের কাছে টেনে মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, ‘তোর বৌদি আমাকে খুব বকল। তুই কিছু মনে করিস না কেমন। আজ আমরা সবাই রাবড়ি খাব, যা চট করে সত্যনারায়ণ থেকে কিনে নিয়ে আয়।’

‘রুটি বেলে নিয়ে যাচ্ছি।’ চাঁদুকে উৎসাহিত দেখাল।

‘না না এখুনি যা বৌদি বেলে নেবে।’

রাতে সরলা আর লোকেশ খাবার সময় চাঁদু দাঁড়িয়েছিল টেবলের কাছে। দুজনের থালায় অল্প রাবড়ি তুলে সরলা বেশির ভাগটা ভাঁড়ে রেখে দিয়ে বলল, ‘চাঁদু তুই এবার খেয়ে নে, রাত হয়ে গেছে, ভাঁড়টা নিয়ে যা।’

‘তোমরা আরও নাও।’ চাঁদু নিমন্ত্রণকর্তার ঢঙে বলল। ‘এটা তোর জন্যই আনা, আমরা তার থেকে ভাগ বসালুম। যা নিয়ে যা।’ লোকেশ মিষ্টি গলায় হুকুম দিল। চাঁদু নিচে চলে যেতেই সরলা বলল, ‘ছেলেটার স্বভাবটা খুব ভাল।’

‘দেখতেও ভাল।’

'হ্যাঁ।'

লোকেশের ভ্রু তার অজান্তেই নড়ে উঠল। চাঁদুর বয়স খুবই কম। তাহলেও...।

'তুমি ভাল করে ওর মুখটা দেখেছ? আমি আজ দেখলাম সিনেমায় নামিয়ে দেওয়া যায়।'

'আশ্চর্য, আমারও একবার তাই মনে হয়েছিল।'

লোকেশ চট করে সরলার মুখ দেখে নিল। সহজ নিষ্পাপ মুখভাব। কোন গোপন ইচ্ছার বীজ বোনা হয়েছে কিনা তা বোঝা যাচ্ছে না। নিজেকে নিয়ে সে কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হল। এই বাতিকটা, সরলা ভ্রষ্টা হতে পারে ভাবাটা কিভাবে কেন যে মাথায় মাঝে মাঝে টিক টিক করে ওঠে এখনো সে তা বুঝে উঠতে পারছে না।

ছোটবেলা থেকে দেখেছে এই বাড়ির বৌ-মেয়েরা পর্দানশীন। জ্যেঠিমা এখনো রিক্সার সামনে পিছনে পর্দা না দিয়ে চড়েন না। লেডিস সীটে ছাড়া সিনেমা দেখে না মেয়েরা। ছোট বেলায় অবিভক্ত বাড়িতে সে দেখেছে, বিয়ের পর জ্যাঠার বড় ছেলে মহাদেব বৌ নিয়ে চৌরঙ্গিতে চীনে দোকানে খেতে গিয়ে ফিরে এসেছিল কেবিনে জায়গা না পেয়ে। পর পুরুষের চোখের সামনে বৌ খাবে এটা তিনি বরদাস্ত করতে পারেন না। রাস্তার দিকে বারান্দায় মেয়েদের পা রাখা, পঞ্চাশের ঊর্ধে বয়স না হলে সেটা বেহায়াপনা গণ্য হয়। আশ্চর্যের কথা এগুলো কখনো কাউকে বলে দেওয়া হয় না, নিজের থেকেই বুঝে নেয়।

কড়াকড়ি সত্ত্বেও কিন্তু কিছু কিছু ঘটনা ঘটেছিল। লোকেশের তখন সাত বছর বয়স। একদিন মাঝরাত্রে চাপা সোরগোলে ঘুম ভেঙ্গে দেখে ঘরে কেউ নেই। গুটি গুটি ঘর থেকে বেরিয়ে অন্ধকার বারান্দায় আসে। সারা বাড়িতে আলো জ্বলছে। শুধু সিঁড়িতে আর তিনতলার ছাদের ঘরে আলো নেই।

একতলায় সিঁড়ির গোড়ায় কাকে যেন মারা হচ্ছিল। ছেলেমেয়ে বৌয়েরা বারান্দায় চুপ করে দাঁড়িয়ে। মেজবৌদিকে সে ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করেছিল কারণটা। চোর চুরি করতে এসে ধরা পড়েছে। যা শুতে যা, ছোটদের এসব দেখতে নেই।' মেজবৌদি তাকে ঠেলে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়েছিল।

পরদিন সে শুনেছিল জগৎ নামে তাদের চাকরটিই ছিল সেই চোর। অল্প বয়সী, বলিষ্ঠ জগৎ খুব অমায়িক ও মৃদুভাষী ছিল। চাল-চলন কথাবার্তা ছিল লেখাপড়া জানা লোকের মত। লোকেশ বাড়িতে তার বাল বিধবা বছর চল্লিশ বয়সের ছোট পিসিকেও দেখতে পায়নি। বড়দার মেয়ে তারই সমবয়সী অমিতা চুপি চুপি বলেছিল, 'ছাদের ঘরে দেখে আয় কে রয়েছে।' লোকেশ জানতে চেয়েছিল, কে রয়েছে? অমিতা বলতে চায়নি। সে ছাদে গিয়ে দরজা তালা বন্ধ দেখে মাকে তখন জিজ্ঞাসা করেছিল, ঘরে কে, কাকে তালা দিয়ে রাখা হয়েছে। মা তার মুখে হাত চাপা দিয়ে বলেছিল, 'যেই থাকুক না, এই নিয়ে কোন কথা বলবি না। বাইরের কারুর সঙ্গে একদম নয়। বললে কিন্তু জ্যাঠামশাই মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দেবে আর ছাদের সিঁড়ি একদম মারাবি না।'

চারদিন পর স্কুল থেকে ফিরে সে দেখে তাদের বাড়িতে অ্যাম্বুলেন্স গাড়ি আর পুলিশ এসেছে। পাড়ার লোক ভিড় করে বাড়ির সামনে, মেয়েরা ছাদে বারান্দায়, সদরে দাঁড়িয়ে। ছোটপিসি ছাদের ঘরে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে। দত্ত বাড়িতে এরপর ছোকরা কি মাঝ বয়সী চাকর আর কখনো রাখা হয়নি।

বছর দশেক পর, দিনরাতের ঝি রানী বালাকে সোনার ঘড়ি চুরি করার দায়ে যখন পুলিশে দেবার ভয় দেখান হচ্ছিল তখন সে গলা চড়িয়ে বলেছিল, যান যান আমাকে আর পুলিশ পুলিশ দেখাবেন না, আমিও তাহলে আপনাদের পুলিশ দেখিয়ে দেব। ছোট পিসিমা কিভাবে মরল তাকি আমি জানি না? ওর গলায় ফাঁস কে দিয়েছিল তাও আমি জানি। জগতের বিছানা থেকে রাত্তিরে কে তাকে চুলের মুঠি ধরে তুলেছিল তাও আমি জানি।'

দশ মিনিটের মধ্যে রানী বালা তার বকেয়া মাইনে আদায় করে দপদপিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছল। ও চলে যাবার পর কোন দিন কেউ আর রানীবালা নামটা মুখে আনেনি, যেন ওই নামের কেউ এ বাড়িতে কখনো কাজ করেনি। দত্ত বাড়িতে জগৎ কাজে লেগেছিল চাঁদুর বয়সেই। তাই লোকেশের বুকের মধ্যে অসুখী ছায়া ভেসে এল যখন সরলা বলল, আমারও তাই মনে হয়েছিল।

'কি মনে হয়েছিল' সিনেমার হিরো হবার মত চেহারা?' 'হ্যাঁ, ওকে কেউ চাকর বলে প্রথমে বুঝতে পারে না।

ভাবে তোমার ভাই কি ভাইপো।' সরলা মুচকি হাসল বলা শেষ করে। শুনেই লোকেশের মুখ কঠিন হয়ে উঠল। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'তোমার ছেলে বা মেয়ের কাকা বলে ভাববে এরপর। তখন শুনতে কেমন লাগবে?'

'কেমন আবার লাগবে, বহু বাড়িতে পুরনো চাকরদের তো দাদা কি কাকা বলে সে বাড়ির ছেলে মেয়েরা। কোন বাড়িতে পুরনো কাজের লোক থাকাটা তো সেই বাড়ির উজ্জত বৃদ্ধি। লোকে বুঝতে পারে বাড়ির আচার -আচরণে ছ্যাঁচড়ামি নেই, ব্যবহারে ভদ্র, উদার। নাইলে লোক টিকে থাকত না দেখ না। অধিকাংশ বাড়িতে লোক আসছে আর চলে যাচ্ছে। কাজের লোকদের পরিবারের একজন করে নিতে পারে না বলে তো।' মুখে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে সরলার। সরু চোখ দুটি আরো সরু হয়ে প্রায় বুঁজে গেছে। 'তুমি তাহলে শ্রীমান চন্দন গড়াইকে এই পরিবারের একজন করবে ঠিক করেছে।' লোকেশ সরলার পাত থেকে এক টুকরো সর তুলে নিল।

'আমি তো ওকে লিখতে পড়তে শেখাব ভাবছি। অশিক্ষিত লোক নিয়ে বড্ড অসুবিধে হয়।'

'শেখাও।' লোকেশ উঠে পড়ল হাত ধোবার জন্য। 'তবে বাড়াবাড়ি করো না। ও পুরুষ মানুষ এই হুঁশটা যেন তোমার থাকে।

বারান্দার অন্য প্রান্তে প্লাস্টিকের ড্রামে জল রাখা। চাঁদু দু'বেলা নিচের থেকে জল তুলে ভরিয়ে রাখে। হাত ধুয়ে লোকেশ ফিরে না আসা পর্যন্ত সরলা টেবলে বসে রইল। লোকেশের শেষ বাক্যটির তাৎপর্য বোঝার জন্য সে ভাবছে।

'হঠাৎ তুমি ওই কথাটা বললে কেন, চাঁদু পুরুষ মানুষ আমি যেন হুঁশ রাখি? আমি জানি না ও পুরুষ মানুষ? নিশ্চয় জান। কিন্তু এটা কি জান তোমায় দেখলেই পুরুষ মানুষরা মাখনের মত গলে যেতে শুরু করে, যেমন গলেছি আমি।' বলেই লোকেশ ঝুঁকে সরলার ঠোঁটে আলতো চুমু খেয়েই ভয় পাবার ভান করে সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, 'ব্যাটা আবার লুকিয়ে দেখছে নাতো।'

গম্ভীর মুখে সরলা চেয়ার থেকে উঠে এঁটো বাসন সাজিয়ে রাখতে শুরু করল। 'একেবারে মোক্ষম সময়ে চাঁদটা ডিস্টার্ব করল। তাড়াতাড়ি এসো।' লোকেশ চপল গলায় কথাটা বলে ঘরের দিকে যাবার সময় সরলা নিতম্বে হাত বুলিয়ে নিল। কাজটা ফিনিশ করতে হবে তো।'

সরলা ভ্রুতুলে শুকনো হাসল। নিজেকে অসুখী বোধ করার কোন কারণ বিয়ের পর থেকে সে এখনো খুঁজে পায়নি। লোকেশ কত শান্তভাবে গর্ভ সঞ্চারের খবর শুনল। মেনে নিল। বুঝদার স্বামী। হ্যাঁ সে সুখীই।

সরলা নার্সিং হোমে যাবার বারো দিন আগে তপু লাইব্রেরীতে বই বদলিয়ে সোজা আসে তার কাছে। দু'চারটে কথার পর বলেছিল, 'আমাদের বাঁশ বেড়ের বাড়িটা বাবা দলিল করে দাদাকে দিয়ে দিয়েছে। এখানকার বাড়িটায় আমার বা দাদার কোন রকম দাবি দাওয়া রইল না, এটা পাবে সতাতো ভাইয়েরা। দাদাকে রেডিমেড জামা কাপড়ের দোকান করে দেবে চন্দননগরে। দাদা রাজি হয়েছে।'

'আর তোর জন্য?'

'আমার জন্য বিয়ের টাকা আর গয়না। মেয়েদের জীবনের লক্ষ্য তো বিয়ে করা তাই।'

'বাড়ির অংশ?'

'পাব না। আমার নিজের মায়ের দশভরি সোনা আর চল্লিশ হাজার টাকা আমি বিয়ের জন্য পাব।'

'বিয়ে তো এখন হচ্ছে না। পড়া শুনোটা তো চালিয়ে যাবি।' 'যাব। তবে বাবার বাড়িতে থেকে নয়। নিজে রোজগার না করতে পারলে সরলাদি, ঘরে বাইরে কোথাওই জোর নিয়ে দাঁড়ান যায় না। আমার মাকে দেখেছি তো, সারা জীবনই বাবার ঝি হয়ে কাটিয়েছে। আচ্ছা সরলাদি, বিয়ে করতেই হবে এমন কোন মাথার দিব্যি কি মেয়েদের দেওয়া আছে?'

'কষ্ট হবে খুব।'

‘হোক। এম, এ পাস করার আগে বিয়ে নয়।’

সরলা শুধু স্মিত মুখে কথাগুলো শুনে গেল। রোজগার করতে না পারা বা ঝি হয়ে জীবন কাটান ইত্যাদি কথাগুলোর খোঁচা তার মনে কিছুটা বিঁধেছে। একসময় সেও এই ভাবেই কথা বলেছে, ভেবেছে। বিএ পাস করা এবং চাকরি দুটোই কিন্তু আর করা হল না। মনের কলকব্জাগুলো নিশ্চিন্তি আর সুখ পেয়ে জং ধরে যায় এটা সে এখন বুঝতে পারছে। তপুর ঝাঁঝ যে তার গায়েও লাগছে মেয়েটা তা বুঝতে পারছে না। প্রসঙ্গ ঘোরাবার জন্য সে বলল, ‘বাঁশবেড়ে চলে গেলে আর তো তোর সঙ্গে দেখা হবে না।’

‘হবে না কেন? কলকাতায় তো রেগুলার আসা যাওয়া করতেই হবে। তোমার বাচ্চা হওয়ার আগে আমি যাচ্ছি না।’

ডাক্তারের আনুমানিক তারিখেই বিটু জন্মেছে। সরলার মা চেয়েছিলেন নার্সিং হোম থেকেই মেয়েকে নিজেদের বাড়িতে নিয়ে যেতে। লোকেশ রাজি হয়নি। আবার কেন শ্বশুরের টাকা খরচ করান। অনভিজ্ঞ নতুন মায়ের পক্ষে বাচ্চা নাড়ানাড়ি করার অসুবিধা হবে ভেবে সে নিজেই শ্বাশুড়ীকে বলেছিল, আপনি বরং কয়েকটা দিন এসে থাকুন।’ তিনি রাজি হয়ে কুড়িদিন মেয়ের বাড়ি ছিলেন।

তপু নার্সিং হোমে আসতে পারেনি। বিটুর জন্মের আগের দিন সে আর তার দাদা অজয় দাদা অজয় বাঁশবেড়ের বাড়িতে চলে যায়। দিন সাতেক পরে সে সরলাকে দেখতে আসে, প্লাস্টিকের ঝুমঝুমি হাতে নিয়ে। সরলা খুব খুশি হয়েছিল ওকে দেখে। তবু বেশিক্ষণ থাকেনি। ট্রেন ধরার তাড়া থাকায়। যাবার সময় ঝুমঝুমিটা বিটুর মুখের কাছে নাড়িয়ে সে বলেছিল, ‘বুঝলে সরলাদি এখন একেবারে নতুন জীবন। মুক্ত স্বাধীন বলতে যা বোঝায় এখন আমি ঠিক তাই। অধীনতা শুধু এই ট্রেনের কাছে, ওর সময় ধরে এখন চলতে হচ্ছে।’

‘আমারও এবার শুরু হবে আর একটা জীবন। তবে তোর মতো মুক্ত স্বাধীন নয়।’

‘কি নাম রাখবে ছেলের?’

‘নাম ওর বাবা রাখবে, এব্যাপারে আমি নেই।’

‘আমাকে যদি বলো তাহলে আমি রাখবো ধ্যানেশ, লোকেশের সঙ্গে মিলিয়ে।’

বিটুর নাম ধ্যানেশই রাখা হয়। তপুর দেওয়া নামটা সরলার কাছে শুনে লোকেশ বলেছিল, ‘বাহ্, চমৎকার নামতো? আমি তো ভাবছিলুম গনেশ কি প্রাণেশ রাখব। তাহলে এটাই থাক।’

বিটুকে দেখতে জ্যাঠাইমা ও বড়বৌ এসেছিলেন। দুটো জামা আর একশো টাকা দিয়ে ছেলের মুখ দেখলেন। যাবার আগে সরলাকে বললেন, এবার একজন দিনরাতের ঝি রাখা কলেজের পড়া আর বাচ্চা মানুষ করা এক সঙ্গে হয় না।’

‘আমিও তাই ভাবছি।’

এই সময় নিচের থেকে বালতিতে জল নিয়ে চাঁদু উঠে এল। ‘তোমার লোক বলতে তো ওই ছেলেটা।’ জ্যেঠিমা চোখ কুঁচকে চাঁদুকে জরিপ করে বললেন, ওকে তো আর বেশিদিন রাখতে পারবে না, আর তো ছোট নেই। বাচ্চাকে নাওয়োন, খাওয়ান, মোতানো, এসব কাজ বাপু বড্ড ঝামেলার, খুব নজর রাখতে হয়। তুমি একটা মেয়েছেলে রাখার কথা লোকুকে বলো।’

জ্যেঠিমার কথা শেষ হবার পরই তার পুত্রবধূ পয়তাল্লিশ বছর বয়সী সরযূ বললেন, ‘আমাদের বাড়িতে বাপু অল্পবয়সী চাকর রাখার নিয়ম নেই।’

‘নিয়ম নেই মানে,’ জ্যোঠিমা তাড়াতাড়ি এর কারণ দর্শালেন, ‘বড্ড হাতটান হয় এই ছোঁড়াদের, যেমন ফাঁকি দেয় তেমনি মুখের উপর তক্কোও করে। তাছাড়া পাড়ার ঝিয়েদের সঙ্গে এমন সব কাণ্ড করে যে লজ্জায় পড়ে যেতে হয়। তাই ছেলে ছোকরা রাখার চল নেই। তুমিই বলো বাইরের একটা মদ্দো ঘোরাফেরা করলে বৌঝিদের অসুবিধে হয় না? কাপড় চোপড় গায়ে কখন ঠিক থাকে না থাকে তাকি বলা যায়?

শাশুড়ির কথা শেষ হতেই সরযূ যোগ করলেন, 'তুমি বাপু রাস্তা দিয়ে চলার সময় ঘোমটা দাও না এটা আমি লক্ষ্য করেছি। মাথায় কাপড় না দিয়ে আমরা বারান্দাতেও বেরোই না।'

'যা বললুম, লোকুকে কিন্তু ঝি রাখার কথা বলো'

সরলা বাধ্য মেয়ের মতো মাথা নাড়ল। 'আপনার ছেলে এলেই আমি বলব।'

সরলা অবশ্য লোকেশকে কিছুই বলেনি। এরপর এক দুপুরে এল রঞ্জনা। দুটো কাঁথা আর দুটো কোলোট উপহার দিল বিটুকে। জিনিষ দুটো দরকারী, সরলা খুশি হয়ে বলল, এতবার ভিজেছে যে কেচে বোদ্দুরে দিতে দিতেই আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত। তোর এগুলো খুব কাজে লাগবে।'

'নিজে করিস কেন, বাসনাকে বল কুড়িটা টাকা বেশি দেব কাঁথাটাথাগুলো দুবেলা কেচে দেবে।'

'বলব,তবে চাঁদু আমাকে খুব সাহায্য করে।'

'তোর ভাগ্যি ভাল তাই অমন একটা চাকর পেয়েছিস। এত কাজ করে যে, আমরা তো বলা বলি করি, চাঁদু চলে গেলে তোরা খুব বিপদে পড়বি।'

সরলা হাসল। মাথা নেড়ে বলল, 'চাদু এ বাড়ি ছেড়ে যাবে না। ও নিজেই বলেছে। ওর বাপ মা কেউ নেই। আমি দেখেছি একটু মিষ্টি কথা, একটু স্নেহ, একটু আত্মীয়র মত ব্যবহার পেলে বর্তে যায়।

'ভাল,' রঞ্জনা ঘরের সর্বত্র চোখ বোলাল। 'ছেলেটা দেখতেও ভাল, আপন করে নেওয়ার মতই চেহারাটা।'

সরলা হাসতে পারল না রঞ্জনার সঙ্গে। তার মনে হল হাসলেই সে নোংরা হয়ে যাবে। রঞ্জনার স্বভাবের গতি প্রকৃতি গত এক বছরের আলাপেই বুঝে গেছে। বারান্দা থেকে ডেকে কথা না বললে তাই সে কথা বলে না।

'এর পরের বাচ্চাটা কবে হবে, ঠিক করেছিস? রঞ্জনা নিজেই অন্য কথায় চলে এল।

'হবে না আর।'

'য়্যা।' অবাক হয়ে গেল রঞ্জনা।'একটাই ব্যস? লাইগেশন করিয়ে নিয়েছিস?'

'হুঁ । যা দিনকাল পড়েছে একটাকে মানুষ করে তোলাই শক্ত। কালকেও তো পাড়ায় বোমাবাজি হচ্ছিল।' সরলার চোখে বিরক্তি ফুটে উঠল।

'এ আরকি এমন, দুতিন বছর আগে যা হোত তা দেখলে তো তোর হাতপা পেটে সিধিয়ে যেত। বারান্দা থেকে দেখেছি ছেলেদের চ্যাংদোলা করে ধরে এই গলি দিয়ে নিয়ে যেত খুন করার জন্য। সে কি চিৎকার আর কান্না। আমায় বাঁচান, আমায় বাঁচান বলে পাড়ার লোকেদের দিকে তাকিয়ে যেভাবে বলত। জীবনে আমি সেই মুখগুলো ভুলব না, মনে পড়লে বুকের মধ্যে কেমন যেন করে ওঠে। তুই বেঁচে গেছিস তখন তোর বিয়ে হয়নি বলে।' রঞ্জনার মুখে দু'বছর আগের ভয় ফিরে এসেছে।

'পাড়ার লোকেরা কিছু করত না, বাধা দিত না?'

'হুউস' নাক দিয়ে তাচ্ছিল্যের শব্দ বার করে রঞ্জনা বলল, ' কে বাধা দিতে যাবে? তাহলে হয় ছোরা নয় বোমায় মরতে হত। কত্তা তো আমাকে একবার টান মেরে ঘরে ঢুকিয়ে বারান্দার দরজা বন্ধ করেই একটা চড় মেরেছিল। বোঝ, কলেজে পড়ায় যে লোক তারও কি রকম বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়ে গেছল।'

উনিতো বলেন এখনকার দিনে সন্তান মানুষ করে তোলা, বিশেষ করে ছেলেদের ভদ্র শিক্ষিত করে তোলা খুব কঠিন। বাইরে ওরা কি করছে, কাদের সঙ্গে মেলামেশা করছে কিছুই তো জানা যাবে না। উনি তাই ঠিক কললেন একটাই যথেষ্ট, আর হয়ে দরকার নেই।' সরলা স্নেহভরে একবার বিটুর দিকে তাকিয়ে তার কথা অনুমোদিত হল কিনা দেখার জন্য রঞ্জনার মুখ লক্ষ্য করল। মুখে তিক্ততা মাখান চাইনি জানালার বাইরে। সরলা সঙ্কোচ বোধ করল। তার কথায় এমনতো কিছু নেই যে ওর ভাবান্তর ঘটবে।

'কি রে হঠাৎ চুপ করে গেলি?'

‘কি আবার বলব? রঞ্জনার নিরাসক্ত স্বর। ‘তোর ভাগ্যটা খুব ভাল। ভাল ঘর, বর, একটা মাত্র ছেলে, বরের ভাল আয়, দেখতেও তুই সুন্দরী,লেখাপড়া করিস, কলেজে যাস, সংসারেও কোন ঝক্কি ঝঞ্ঝাট নেই একটা মেয়ের যা যা চাওয়ার সবই পেয়েছিস, সোনার সংসার। তোকে দেখে এক একসময় খুব হিংসে হয়।’

সরলা কি যে বলবে ভেবে পেল না। রঞ্জনার মুখ করুণ দেখাচ্ছে। ‘কিছু বদলায়নি, সব সেই একশ’ বছর আগের মতই রয়েছে।’

‘চা খাবি? অবশেষে সরলা বলল।

‘না।’ রঞ্জনা উঠল। ‘সুখ ধরে রাখতে হয়, না হলে পালিয়ে যায়। এটা মনে রাখিস।’

সরলা আঠারো বছর সুখ ধরে রেখেছে। বছরগুলো যে কিভাবে সাঁই সাঁই করে পিছনে চলে গেল, কিভাবে তার বয়স বাড়ল, সংসারের বাড় বাড়ন্ত ঘটল তার কোন ধারবাহিক স্মৃতি সে ধরে রাখেনি। রাখার দরকার বোধ করেনি। আঠারো বছরে কিছুই ঘটেনি তার জীবনে। মসৃণ দিনরাতের পথ দিয়ে সে ব্যস্ত বেগে চলে এসেছে। বিটু জন্মাবার একমাস পর লোকেশ সন্ধ্যাবেলায় একটা লোককে সঙ্গে করে বাড়ি ফিরেছিল। কি ব্যাপার?

বাচ্চা হবার পর তলপেটের মাসল, ফাইবার ঢিলে হয়ে যায়। ওটাকে টাইট করে বেধে রাখা দরকার।’ লোকেশ তাকে বুঝিয়ে ছিল।

‘ধ্যাৎ, ঝুলে পড়বে আবার কি। এইতো ঠিকই রয়েছে’ সরলা তলপেটে হাত রেখে বলেছিল।

‘ঠিক তুমি বলছ, আমি বলছি নেই।” লোকেশ বলতে বলতে সরলার তলপেটে হাত রেখে খামচে ধরল। ‘আহ লাগে, কি হচ্ছে, চাঁদু এসে পড়বে।’

‘দেখলে তো ঢিলে হয়ে গেছে বলেই তো ধরা গেল। এ জন্যই তোমায় কাপড়ের বেল্ট পরতে হবে। লোক এনেছি, মাপ নিয়ে বেল্ট তৈরি করে দেবে।’

সরলা মাপ দিল, বেল্টও তৈরি হয়ে এল। হাঁটু গেড়ে বসে লোকেশ সরলার তলপেটে বেল্ট জড়িয়ে বকলেস লাগিয়ে দিল।

‘উহহ্ লাগছে।’

‘লাগুক, সারাক্ষণ টাইট করে এটা পরে থাকতে হবে। শরীরের এত সুন্দর জায়গাটা নষ্ট হলে আমি.....’ লোকেশ মুখ তুলে তাকাল। সরলা তখন কি যেন ওর চোখে দেখতে পায় যাতে সে রমণী জীবন সার্থক হয়েছে ভাবতে পেরেছিল। লোকেশ ওর তলপেটে মুখ চেপে ধরে অস্ফূট স্বরে বলেছিল, ‘তোমার এই শরীরটা পাওয়া মানে ভগবানের বর পাওয়া।’

শিবেন্দ্রর তাগিদেই বিটুর কোষ্ঠি করান হয় যখন ওর এক বছর বয়স।

হলুদ রঙে পাকানো কাগজটা খুলে সরলার চোখের সামনে ধরে লোকেশ বলেছিল, ‘পরে পড়ে নিও আগে শোন কি ভবিষ্যদ্বাণী করেছে ..... না থাক।’ কোষ্ঠিটা আবার পাকিয়ে সে সরলার কৌতূহলকে টানটান করে দিয়েছিল।

‘থাক কেন, কোন অমঙ্গুলে কথা আছে নাকি? আয়ু কত হবে বলেছে?’

‘বলেছে, ঊনআশি বছর।’

সরলা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। ‘মাত্তর’।

‘মাত্তর মানে এটা বেশিই তো। ইণ্ডিয়ানদের গড় আয়ু কত জান? এখন বাষট্টি, বাবাদের আমল ছিল পঁয়ত্রিশ। সেই তুলনায় ঊনআশি তো কলকাতা থেকে হেঁটে চাঁদে পৌঁছানোর মত সময়। আমরাতো তখন মরে ভূত হয়ে যাব।’

‘এসব নিয়ে ঠাট্টা আমার ভাল লাগে না, আর কি লিখেছে?’

আর লিখেছে জাতকের মা দিনে দিনে সুন্দরী হবে আর বাবাটা কুচ্ছিত হবে।

'ছিঁড়ে ফেলে দাও কোষ্ঠিটা' সরলা কোপ প্রকাশ করে মুখ ঘোরাল।

'দিচ্ছি, আর লিখেছে বিটু অত্যন্ত মেধাবী হবে, দেশ জোড়া খ্যাতি পাবে, যশ আর ধনলাভের প্রবল সম্ভাবনা।'

'ফাড়া।'

ছিঁড়ে ফেলি এবার ? লোকেশ দু'হাতে ধরে কোষ্ঠিটা ছেঁড়ায় উদ্যত হল।

'আঃ ফাজলামো রাখো, ফাঁড়ার কথা কিছু বলেছে?

মা বলছিল, বদ্যিনাথ বাবার কাছে থেকে মাদুলি এনে বিটুকে পরাবে।

লোকেশের মুখ থেকে চাপল্য ঘুচে গিয়ে গাম্ভীর্য দেখা দিল। 'ওর একত্রিশ থেকে চৌত্রিশ বছরের মধ্যে কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হবার প্রবল সম্ভাবনা আছে। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম জ্যোতিষী মশাইকে সম্ভাবনা বলতে কি বোঝায়? উনি রোব থেকে শনি যাবতীয় গ্রহের নাম, তাদের যাতায়াত, কে কবে বাকে ধাক্কা মারবে তার হিসেবে বুঝিয়ে শেষকালে বললেন স্বস্তয়ন করলে গ্রহশান্তি লাভ হবে। স্রেফ পয়সার ধান্দা। আমাকেও রত্ন ধারণ করতে বললেন, গোমেদ আর পলা।'

থমথমে হয়ে গেল সরলা। ক্ষীণস্বরে বলল,' ওই একটাই ছেলে, আর হবে না, আমি কোন চান্স নেব না।'

'আর একটা কথাও কোষ্ঠিতে আছে, পুত্রভাগ্যে পিতার ধনলাভ হবে।'

'হোক। স্বস্তয়ন আমি করাব।'

লেখাপড়া শিখেও তুমি এ সব বিশ্বাস কর? সায়ান্স আর টেকনলজির যুগে'।.... কিন্তু কথা শেষ করতে পারল না।

'আমি স্বস্তয়ন করাব'। গোঁয়ারের মত সরলা মুখ তুলে, জলন্ত চোকে বলল, কাটাকাটা স্বরে। লোকেশের তর্ক করার আর সাহস হল না সরলার এই জেদি ভঙ্গির সামনে।

'উনি বলেছেন এক্ষুনি যে করাতে হবে তার কোন মানে নেই। পরেও করা যেতে পারে। ফাঁড়াতো একত্রিশ বছরের পর।'

' তা হোক, তুমি ওর সঙ্গে দেখা করে বলো যে আমরা স্বস্তয়ন করাব, আর তুমি ও রত্ন ধারণ করবে।'

এর ছয়দিন পর খবরের কাগজে লটারির সাপ্তাহিক ফলের নম্বরগুলোয় চোখ বুলাতে গিয়ে লোকেশ চমকে উঠল। চীৎকার করে সরলাকে ডেকে সে ম্যানিব্যাগ থেকে লটারির টিকিটটা বার করে নম্বর মেলাল।

'দ্যাখ, দ্যাখ, চতুর্থ পুরস্কারে আমার নামটা রয়েছে, পঞ্চাশ জন পাবে দেড় হাজার টাকা।'

সরলাও টিকিটের নম্বর মেলাল। অবাক ভাবটা কাটিয়ে ওঠার পর বলল, 'বিশ্বাস হল তো? কুষ্ঠিতে কি লেখা আছে? পুত্রভাগ্যে পিতার ধনলাভ! বিএসসি পাস করেছ বলে তো খুব অবিশ্বাস করো, এইবার কি বলবে?'

লোকেশ চুপ করে রইল।

'এই টাকা দিয়েই স্বস্তয়ন করাব, আজই যাও জ্যোতিষী মশাই, এর কাছে।'

লোকেশ জবাব দেয়নি। হোম যজ্ঞকার স্বস্তয়ন হয়েছিল দু সপ্তাহ পরে।

তপু মাঝে মাঝে আসত। বিএ পাস করার পর খবরটা দিতে এসেছিল। তখনি জানায় ওর দাতা অজয় বিয়ে করেছে চন্দননগরের একটি মেয়েকে। দোকানেই আলাপ হয়েছিল। ক্লাস টেন পর্যন্ত পড়া, অত্যন্ত মুখরা এবং তপুর সঙ্গে বনছে না।

'সরলাদি তোমাদের একতলার ঘরটা খালি দেখলাম, কোচিংটা কি উঠে গেছে?'

‘হ্যাঁ উনি অনেকদিন আগেই বলে দিয়েছিলেন ঘরটা দরকার। মাস দুই হল সমাজপতি রোডে একটা বড় ঘর পেয়ে উঠে গেছেন।’

‘ঘরটায় আমায় থাকতে দেবে? তা হলে আর দাদার বৌয়ের ট্যাকট্যাকানি শুনতে হয় না। ভাড়া দেবো। তোমাদের পেয়িং গেষ্ট হয়ে থাকব।’

কিন্তু তোর জামাই বাবু যে ওটাকে বসার ঘর করবে বলে ঠিক করেছে। এখন তো উনি ফিল্ড সুপারভাইজার, বাইরের লোকজন আসে, তাদের বাবার ঘরে বসানো খুব অসুবিধে হয়। পরে যখন আরও উপরে ডিভিশন্যাল ম্যানেজার হবেন, একদিন হবেনই, তখন তো ঘরটায় কার্পেট পাততে হবে।

এরপর তপু আসেনি। তিন বছর পর দিল্লি থেকে ওর একটা চিঠি এসেছিল। তপু তার জেদ বজায় রেখেছে। এমএ পাস করেই বিয়ে করেছে। শ্বশুর বাড়ি দিল্লির চিত্তরঞ্জন পার্কে। স্বামী ব্যাংকের অফিসার। চিঠির শেষে লেখা, দাদা খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে যোগাযোগ করে। দিল্লি থেকে পাত্র আমাকে দেখতে আসে এবং পাঁচ দিনের মধ্যে বিয়েটা হয়ে যায়। তাই কাউকেই জানাতে পারিনি। ওরা চল্লিশ বছর দিল্লির বাসিন্দা। বিয়ের আগে বরকে একবারই দেখেছি। বাড়ির বড় ছেলে, মানুষ ভাল, রসকষ একটু কম, অফিসের কথাই বেশি বলে। এরা বেশ কনজারভেটিভ। মাঝে মাঝে হাঁপিয়ে উঠি। কলকাতায় গেলে ওকে নিয়ে তোমাদের বাড়ী যাব। বাচ্চা কমপক্ষে তিন বছরের আগে নয়, যদিও বাচ্চা আমি ভালবাসি।

বিটু এখন ইংরেজি মিডিয়াম সেন্টজন স্কুলের ছাত্র। তার আগে বাড়ির কাছাকাছি এক নার্সারি স্কুলে পড়েছে। পাবলিক বাসে স্কুল যায় চাঁদুর সঙ্গে, ফেরেও তার সঙ্গে। চাঁদু, এখন ধোপদুরস্ত ধুতি আর শার্ট পরে। অবশ্য বাড়ির যে সব কাজ আগে করত তা করে যাচ্ছে। ওর মাইনে এখন পাঁচশ’ টাকা। ইংরেজী ও বাংলায় নাম সই করতে পারে, যোগ বিয়োগটাও শিখেছে। সরলা ওকে ব্যাংকে নিয়ে গিয়ে অ্যাকাউন্ট খুলিয়েছে। মাইনের সবটাই সে জমায়। টেলিফোন ধরে অপরিচিত লোকের সঙ্গে বিনীত ভঙ্গিতে কথা বলে বা ফোন নাম্বার লিখে রাখার দরকারটাও সে বোঝে। বিটু যখন আট বছরের শিবেন্দ্র মারা গেলেন কিডনীর অসুখে। ডাক্তার বলেছিলেন একটা কিডনী বদলাতে হবে। হিসেব করে দেখা গেল এজন্য খরচ হবে প্রায় লাখ টাকার কাছাকাছি। চারবার ডায়ালিসিস করিয়েই লোকেশ চিন্তায় পড়ল। বাবাকে বাঁচিয়ে রাখতে মাসে যদি চারবারও ডায়ালিসিস করতে হয় তাহলে মাসে কম করেও অন্তত সাড়ে তিন হাজার, যেটা এখন তার মাইনের সিকিভাগ। মাসে মাসে এতটাকা চলে যাবে আটষট্টি বছরের এই লোকটিকে জিইয়ে রাখতে! ভাবতে ভাবতে লোকেশ এমন এক মানসিক অবস্থায় পৌছয় যখন সে মনের অগোচরেই বিদ্রোহ করল নিজের কর্তব্যবোধ এবং সুকুমার অনুভূতিগুলির বিরুদ্ধে।

কত বছর ধরে বাবাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সে মাসে মাসে এত টাকা দিতে পারবে? কিডনী বদল করে বাঁচিয়ে রাখতে গেলে শুধু কিডনী কিনতেই হাজার পঞ্চাশ টাকা বেরিয়ে যাবে। সে নিজে যদি একটা কিডনী দেয় তাহলে অবশ্য এই টাকাটা বাঁচবে।

সরলাকে বলতেই সে আঁতকে উঠেছিল। ‘সে কি গো। না না, তুমি কিডনী দেবে না। জানি একটা কিডনী নিয়েও লোকে বেঁচে থাকে। কিন্তু ভগবান না করুন, যদি সেটা খারাপ হয়, তাহলে? আমার কথা বাদ দাও। বিটুর কথাটা ভাব।’

‘তাহলে লাখ খানেক টাকা আমি পাব কোথায়? লোকে তো বলবে ছেলে চিকিৎসা করায়নি বলে বাপ মরে গেল।’

‘লোকেরা কেউই জানে না বাবার কি অসুখ হয়েছে। আমি কাউকেই কিছু বলিনি।’

‘চারবার গাড়ি করে নার্সিং হোমে ডায়ালিসিস করাতে নিয়ে গেলুম পাড়ার বহু লোকই দেখেছে। ও বাড়ির বড়দার ছেলে কার্তিক তো আমায় জিজ্ঞাসাও করল কোথায় নিয়ে যাচ্ছি। কিডনী ফেইলিওরের কথা অবশ্য বলিনি কিন্তু জেনে তো যেতে পারে।

‘জানুক না, তাতে হয়েছে কি?’

‘হয়েছে নয় হবে। সবাই তখন কি চিকিৎসা হচ্ছে জানার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়বে। বড় চাকরি করে আর বাপের জন্য লাখ টাকা খরচ করবে না, তা কি হয়? কিন্তু লাখ টাকাতো আর জমান নেই যে চেক কেটে দিয়ে দেব। প্রভিডেন্ট ফাণ্ডেও অত টাকা নেই। বাড়িটা বিক্রি করে অবশ্য চেষ্টা করা যায়, এটাতো বাবারই।’

‘তা হয় না। নিজের বাড়ি ছেড়ে ভাড়া বাড়িতে থাকা!

পারবে তুমি?’

জবাব না দিয়ে মুখ নিচু করে লোকেশ গোমেদের আংটিটা আঙ্গুলে ঘোরাতে থাকে। সরলা তখন একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল ছবিটার দিকে। চিড়িয়াখানার হরিণটাকে ছোলা খাওয়াচ্ছে তিন বছরের বিটু। ভয় আর আনন্দ মুখটাকে মজার করে দিয়েছে, শক্ত করে ওর হাত ধরে আছে সরলা। ছবিটা লোকেশের তোলা।

‘তা হলে কি ঠিক করলে?’ সরলা শুকনো গলায় ফিসফিসিয়ে বলে।

‘ভেবে দেখি’।

পঞ্চমবারের ডায়ালিসিসের জন্য লোকেশ তার বাবাকে নিয়ে গেল না। চাঁদু শুধু বলেছিল, ‘আজ বুধবার দাদুকে নিয়ে যাবার দিন।’

লোকেশ গম্ভীর মুখে বলে, ‘জানি’। তারপর সে টেলিফোন তুলে ডায়ল করল।

‘হ্যালো, সানি নার্সিং হোম?... আচ্ছা কাল আমার অফিসে আপনারা ফোন করে জানিয়েছিলেন আপনাদের ডায়ালেসিস মেশিনটা খারাপা হয়ে গেছে, সেটা কি সারান হয়েছে?..... হয়নি, পার্টস ভেঙ্গে গেছে। কোনও দোকানে পাওয়া যাচ্ছে না? তাহলে তো বিপদে পড়লাম।

..... হ্যাঁ হ্যাঁ প্লিজ, সারান হলেই ফোনে একবার জানিয়ে দেবেন।’

টেলিফোন রেখে লোকেশ চাঁদুর মুখের দিকে তাকাল।

‘মুশকিল হল।’

‘অন্য কোথাও করান যায় না?’ চাঁদু উৎকণ্ঠা নিয়ে বলল।

‘না। মাত্র এই একটা জায়গাতেই হয়। বিলিতি মেশিনও যে খারাপ হয়। তুই একটু ফোনের কাছাকাছি থাকিস যদি খবর দেয়।’

লোকেশ অফিসে বেরিয়ে যাবার আগেই বিটুকে নিয়ে স্কুলে পৌঁছে দিতে গেল চাঁদু। ফিরে এসে কাজের মধ্যে ও কান পেতে রইল ফোন বাজার শব্দের জন্যে। বিটুকে স্কুল থেকে বাড়িতে এনে সে আবার কান পেতে রইল। বিকেলে ফোন বাজল। সে ছুটে গিয়ে দেখল সরলা কথা বলছে।

‘না নার্সিং হোম থেকে কোন ফোন আসেনি। চাঁদু?

ও এখানেই দাঁড়িয়ে..... তুমি আর একবার ওদের ফোন করো। .... নিজেই যাবে?... আচ্ছা।’

‘কি হবে বৌদি?’ ভীত চোখে চাঁদু তাকিয়ে। সরলা চোখ সরিয়ে নিল।

‘কি আবার হবে, মেশিন আজকালের মধ্যে নিশ্চয় সারাবে, তখন বাবাকে নিয়ে গেলেই হবে।’

শিবেন্দ্রকে আর নিয়ে যাওয়ার সুযোগ এল না। কেননা ডায়ালিসিস মেশিনের পার্টসের খোঁজে বোম্বাই– এ যে লোক গেছে সাত দিনেও সে ফিরে আসেননি। অগত্যা শিবেন্দ্র আর অপেক্ষা না করে পরপারের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলেন। সরলা ও লোকেশ কেঁদেছিল, চাঁদু পারেনি।

শিবেন্দ্রকে শেষবারের মত দেখতে এসেছিলেন তার দাদা আর ভাই। অমূল লাল নীরবে কিছুক্ষণ ভাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সময় বলেছিলেন, ‘শিবু এত তাড়াতাড়ি চলে যাবে ভাবিনি। কিই বা বয়স হয়েছিল’।

‘মেশিনটা ঠিক থাকলে দাদু চলে যেতেন না।’ পিছন থেকে চাঁদু বলে ওঠে। লোকেশ চমকে ফিরে তাকিয়েই অস্বাভাবিক স্বরে চীৎকার করে, ‘তোকে ওস্তাদি মেরে কথা বলতে কে বলেছে ? চাকর চাকরের মত থাকবি।’

ফ্যালফ্যাল করে চাঁদু তাকিয়ে থাকে। এমন রূঢ় কথা এই বাড়িতে সে প্রথম শুনল। জ্যাঠামশাইও অবাক হয়ে লোকেশের দিকে তাকিয়ে ছিলেন ভ্রু তুলে। নিজেকে শোকগ্রস্ত অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে লোকেশ কয়েক সেকেণ্ড সময় নেয়। ‘ছোট থেকে আছে তা তাই আস্কারা পেয়েছে।’

জ্যাঠামশাই নির্বিকার মুখে বলেন, ‘একটু বেশিই পেয়েছে, পরে না পস্তাতে হয়। যেখানে যেখানে খবর দেবার দিয়ে দাও। মেজ আর সেজ পিসিকে ফোন করো, ওদের মেজদাকে শেষবারের মত দেখে যাক আর খাটটা একটু ভাল কিনো।’

শিবেন্দ্রর মাথার কাছে বসে নৃত্যলাল হু-হু করে কেঁদে ফেলেন। চাঁদু তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে ‘কেঁদে আর এখন কি হবে। দাতা তো এত চেষ্টা করলেন কিন্তু মেশিন যদি ঠিক করা না যায়, দাদা আর কি করতে পারে।’

চাঁদুই শবযাত্রার আগে খই আর পয়সা ছড়াতে ছড়াতে গিয়েছিল। তার পিছনে ছিল কীর্তনের দল। বাবার শ্রাদ্ধে লোকেশ আলাদা বাড়ি ভাড়া নিয়ে প্রায় পাঁচশ’ লোক খাওয়াল, বারোজন ব্রাহ্মণকে পিতলের থালা গ্লাস ও একশো টাকা দক্ষিণা দিল, লাইব্রেরীকে দান করল বাবার কাঁচের আলমারিটা, তাতে সাদা অক্ষরে লেখা, ‘শিবেন্দ্র লাল দত্তর স্মৃতিতে।’

আত্মীয় কুটুম্ব ও বন্ধু বর্গের ভোজনের পর ভাড়া করা শ্রাদ্ধ বাড়ি থেকে রাত বারোটা নাগাদ লোকেশ ও সরলা ফিরেছিল।

ইদানীং লোকেশ যৎসামান্য মদ খেতে শুরু করেছে। অফিসের নানান কাজে আসাম বা উড়িষ্যায় প্রায়ই যেতে হয়। তখনই সে অল্পস্বল্প খেতে শুরু করে। কলকাতাতেও কয়েকবার খেয়েছে তবে লোকের বাড়িতে নিমন্ত্রণে এবং সামান্যভাবে। শুধু সরলা ছাড়া বাড়ির আর কেউ তা জানে না। বাড়িতেও সে প্রায়শই খায়। বিটু ঘুমিয়ে পড়লে, দরজা বন্ধ করে রাত্রে আলমারি থেকে বোতল বার করে দুপেগ খেয়েই শুয়ে পড়ে। শিবেন্দ্র বলেন, খেয়ে মানুষ নষ্ট হয় না, নষ্ট হয়ে মানুষ মদ খায়। লোকেশ বাবার চোখে নষ্ট ছেলে হতে কোনভাবেই চায় না।

‘এতে হার্ট ভাল থাকে। এক্সারসাইজ তো হয় না, অ্যালকোহলে হার্টটা জোরে দপদপ করে, রক্ত চলাচল দ্রুত হয়।’ লোকেশ যুক্তি দিয়েছিল সরলাকে।

সরলা তা মেনে নিয়ে বলেছিল, ‘তবে দেখ বাপু, বাড়িয়ে ফেল না। ও বাড়িতে তোমার মেজদা এক এক রাতে বাড়ি ফিরে যা তুলকালাম করে।’

না, ওরকম আমার হবে না। মেজদার ওরকম হয় ডীপ ফ্রাষ্ট্রেশন থেকে। ক্ল্যাসিকাল গান শিখতে যেত ওস্তাদের কাছে। সেখানে ভাব হয় একজনের সঙ্গে, আমি তাকে দেখেছি শিক্ষিতা এবং সুন্দরীও। তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল মেজদা। জ্যাঠামশাই না বলে দেয়। বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবে, সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করবে, এই সব হুমকি দিয়ে মেজদার তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দিল। তারপর থেকে কি রকম যেন হয়ে গেল, গানও ছেড়ে দিল।’

‘সম্পত্তি হারাবার ভয়ে বিয়ে করার সাহস হল না?’ সরলা তখন শাড়ির আঁচল দাঁতে কামড়ে বুকের সামনে ঝুলিয়ে ব্লাউজ খুলছিল। লোকেশ মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রয়েছে অনাবৃত কাঁধের দিকে।

‘এখনই শোবে নাকি? দাঁড়াও এইটুকু রয়েছে শেষ করে নিই।’

‘যা গরম পড়েছে। ঘাম সারাক্ষণই লেগে রয়েছে। সরলা দুহাত পিঠের দিকে মুচড়ে ব্রেসিয়ার খোলার চেষ্টা করছিল। তারিফের স্বরে লোকেশ বলল, ‘তোমার ওটা না পড়লেও চলে, কোন দরকারই নেই।’

হ্যাঁ তাই করি আর তোমার মুখ ঝামটা খাই। দরকার নেই আমার। জানি তো তোমার ব্লাউজের ঝুল কম নিয়ে কি সব খারাপ কথা বললে মনে আছে? তার আগে একদিন বললে, বগলকাটা ব্লাউজ পরলে আমাকে দারুণ দেখাবে। কোনটা যে তোমার মনে কথা এতদিনেও আমি বুঝতে পারলাম না।

‘রাতে এই সময় একবার পরতে পার।’

‘এই সময়? শোবার আগে একবার পরা?’ সরলা দরজার ছিটকিনি খুলল বাইরে যাবার জন্য।

‘কোথায় যাচ্ছ এখন?’ লোকেশ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল।

‘ভিজে তোয়ালেতে গা মুছব।’

‘দাঁড়াও আমি তোয়ালে ভিজিয়ে আনছি। বারান্দায় কে আছে না আছে, বুক খুলে’..... লোকেশ ব্যস্ত হয়ে বেরোল।

‘এত রাতে বারান্দায় কে আবার থাকবে।’ সরলা বিরক্তি প্রকাশ করেছিল।

ভিজে তোয়ালে নিয়ে ফিরে লোকেশ উত্তর দিয়েছিল, ‘আমি ছাড়াও তো এ বাড়িতে পুরুষ মানুষ আছে।’

‘তুমি চাঁদুর কথা বলছ?’ সরলা অবাক হয়ে গেল। লোকেশ এক ঢোকে বাকিটা শেষ করে। জবাব দেয়নি।

রাত বারোটায় শ্রাদ্ধবাড়ি থেকে ফিরেই লোকেশ আলমারি খুলে বোতল বের করেছিল। মাস দুয়েক আগে বোম্বাইয়ে সেলস সম্পর্কে হায়ার একজিকিউটিভ ট্রেনিং-এর জন্য গিয়েছিল। তখন সেলস ম্যানেজার তাকে একটা জনিওয়াকারের বোতল উপহার দেয়। সেটা এতোদিন তুলে রেখেছিল বিশেষ কোনো উপলক্ষে খুলবে বলে।

সরলা ভ্রু কুঁচকে বলে, ‘আজ না খেলেই পারতে।’

‘কেন শ্রাদ্ধটাদ্ধ তো মিটে গেছে। বাবাকে তো ঘটা করেই...।’ লোকেশ ছিপির প্যাঁচ কাটার জন্য মুখটা বিকৃত করে মোচড় দিল। কটকট শব্দ হল। একবার সে সরলার মুখের দিকে তাকিয়েই গ্লাসে ঢাললো এবং পরিমাণটা বেশিই।

‘বরফ এনে দেব?’

‘থাক।’ লোকেশ কাচের জগ থেকে গ্লাসে জল ঢেলে চোখের সামনে তুলে ধরল। ‘বিলিতি। আমার উন্নতি হয়েছে বাবা সেটা দেখে গেছেন।’ এই বলেই এক চুমুকে গ্লাস শেষ করে সরলার দিকে তাকিয়ে, বাহবার দাবী জানানোর মতো করে হাসলো।

গ্লাসে আবার ঢেলে লোকেশ চোখ কুঁচকে বিটুর হাত থেকে হরিণের ছোলা খাওয়ার ছবিটা দেখতে দেখতে বলল, ‘সুন্দর দৃশ্য, ভালই তুলেছি। এটাকেই তো বাঁচিয়ে রাখতে চাই।’

উঠে গিয়ে সে ছবির সামনে দাঁড়াল। গ্লাসটা একবার ছবির কাচে ঠেকিয়ে চুমুক দিল।

‘বিটুকে বিদেশে পাঠাব। না আমেরিকা-ফ্যামেরিকা নয়, গাদাগুচ্ছেরা ওখানে গিয়ে জুটেছে। জাপান পাঠাব।’

লোকেশ বাঁ হাতের তালু মাথায় বোলাল। তবলায় চাটি মারার মত আঙুল দিয়ে বাজাল। সরলা অবাক হয়ে শুধু দেখে যাচ্ছে।

‘জীবনে এই দ্বিতীয়বার ন্যাড়া হলুম। খুব ছোটবেলায় বিটুর থেকেও ছোট, খুব ফোঁড়া হত। বাবা কেষ্ট নাপিতকে দিয়ে কামিয়ে দিয়েছিল। তোমার কখনও ফোঁড়া হয়েছে মাথায়।’

‘না।’

‘বিটুর হয় না। ওর ধাৎটা তোমার মত হয়েছে।’ লোকেশ আবার এক চুমুকে গ্লাস শেষ করলো। এবার হাতটা একটু কেঁপে উঠল। ‘তুমি বেশি খাচ্ছ।’

‘খাই একটু। আজ স্পেশাল অকেশন তো।’ লোকেশ বোতল থেকে গ্লাসে ঢালল। সরলা গ্লাসে জল ঢেলে দিতে জগটা তুলল।

‘থাক, আমিই ঢালছি। বিটুকে জাপান পাঠাব। ওরা ভাল মেশিন তৈরি করে। জার্মানিও করে কিন্তু আমি জাপানেই পাঠাব। ওদের মেশিন খারাপ হয় না কখনও, নেভার। এই যে রেডিও– ওটা জাপানি, টেপ রেকর্ডারটা জাপানি, টিভিটার সার্কিট জাপানি নকশা থেকে।’ লোকেশ গ্লাসে জল ঢেলে চুমুক দিল।

সরলা চুপ। তার মনে হচ্ছে লোকেশের এইসব অনর্থক আবোল-তাবোল, মনের একটা ভয়ংকর অবস্থা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য। আর সেই ভয়ংকর অবস্থাটা যে কি, সেটা সে আন্দাজ করতে পারছে।

‘জাপানি মেশিন খারাপ হয় না। খারাপ হয় ব্যাড হ্যান্ডলিং-এ। মানুষও খারাপ হয় এই কারণেই। সাহস না থাকলে, সেলফ কনফিডেন্স না থাকলে, বিশ্বাস না থাকলে হ্যান্ডল করবে কি করে। তোমার সাহস আছে? আমি যদি আজ মরে যাই পারবে এই পৃথিবীকে ফেস করতে?’

পারবে? বিটু পারবে?... আমি কিন্তু পারব। আই অ্যাম সেলফ মেইড। লোকেশ গ্লাসটা বুকে ঠেকাল।

‘তুমি এতবার মেশিনের কথা বলছ কেন?’

লোকেশ যেন শুনতে পায়নি, পূর্বকথার জের টেনে ধরে সে বললো, ‘আমি খেটেছি, বুদ্ধি খরচ করেছি, ভাগ্যও ফেবার করেছে। একটা ভাল চাকরি করছি। সুন্দরী বৌ.... না না, প্রতিবাদ কর না, তুমি অত্যন্ত অ্যাট্রাকটিভ, আমায় দুনিয়ার পুরুষরা হিংসে করে কেন জান? তোমার সঙ্গে বিছানায় শোয়ার ছাড়পত্র আমার আছে, কিন্তু তাদের নেই বলে। এছাড়া একটিমাত্র ছেলে, সেও দেখতে সুন্দর, স্বাস্থ্যবান, পড়াশোনায় মন আছে। কেমন একটা পারফেক্ট মেশিন আমি বানিয়েছি, সর্বাঙ্গ সুন্দর, নিখুঁত। এটা কখনও খারাপ হবে না বলেই আমার ধারণা ছিল।

লোকেশ খাটে সরলার পাশে বসল। মুখ নিচু করে মেঝের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে মাথা নাড়তে শুরু করল। সরলা ওর বাহু আঁকড়ে ধরল।

‘এবার শুয়ে পড়, সারাদিন ধকল গেছে।

‘হ্যাঁ গেছে। তাতে কি হয়েছে, আমার অভ্যেস আছে। তুমি বরং শুয়ে পড়... একটু খাবে?’ লোকেশ গ্লাসটা সরলার মুখের কাছে ধরল– ‘অনেকেই খায়। ও বাড়ির মেজ বৌদিকে রাতে দরজা বন্ধ করে মেজদা খাওয়াত। ছাদ থেকে আমাদের চাকর দেখেছিল খোলা জানালা দিয়ে। সে আমায় বলেছিল, আমি তখন বিটুর বয়সী।’ বলেই লোকেশ হেসে উঠে সামনে ঝুঁকে পড়ল। হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল প্রায়, সরলা দু’হাতে জড়িয়ে ধরল।

‘এবার শোও, কাল তো সকাল সকাল উঠতে হবে।’

‘ঠিক আছি, আমার কিছু হয়নি। এটা হল স্কচ। লোকেশ গ্লাস বাড়িয়ে দিল সরলার মুখের কাছে। ‘খাও।’

ওর চোখ-মুখের অবস্থা লক্ষ্য করে সরলা গ্লাসটা হাতে নিল। ‘সামান্যই তো, খেয়ে নাও, এতে চরিত্র নষ্ট হবে না।’

সরলা এক চুমুকে গ্লাসটা খালি করে লোকেশের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। মুখটা একবার বিকৃত করল মাত্র।

‘ভাল না?’

‘হ্যাঁ, এবার শোও।’

‘তুমি ব্লাউজ খুলবে না?’

‘না।’

‘ইসস্ একটু দেখতুম।’

‘আজ এসব থাক।’

‘থাকবে। কেন? ন্যাড়া হয়েছি বলে? বাবা ভাল তবলা বাজাত, জ্যাঠামশাই এস্রাজ বাজাত। গান-বাজনার চর্চা

ছিল দত্ত বাড়িতে। এখন কিছুই নেই। এস্রাজ তো কেউই বাজায় না।... ব্লাউজ খুলবে না।'

'বললুম তো আজ থাক।'

'কেন থাকবে।' সটান দাঁড়িয়ে উঠল লোকেশ। 'আমাকে অমান্য? কেন আজ থাকবে?' চাপা গর্জনের মত কথাগুলো শোনাল।

সরলার মুখ ফ্যাকাসে দেখাল। কথা না বলে সে ঘরের দরজা বন্ধ করতে গেল।

'দরজা কেন বন্ধ করছ? জানালা বন্ধ কর, ছাদ থেকে রাত্তিরে কে দেখছে তুমি কি তা জান? চাঁদু এখন কোথায় তা কি তুমি জান? দরজা বন্ধ করা হচ্ছে, হুঁউ।'

সরলা জানালাগুলো বন্ধ করতে লাগল। মেইনট্যানান্স, হ্যান্ডলিং-এর উপর নির্ভর করে মেশিনের আয়ু। আমার মেশিন খারাপ হতে দেব না। আই মেড ইট, আমিই ইঞ্জিনিয়ার, বিশ্বকর্মা। আজ রাতে আমি ডেডিকেট করব শিবেন্দ্র লাল দত্তকে, ডেডিকেশন মানে জান? উৎসর্গ, বাবাকে উচ্ছুগ্যো করবো, খোলো।'

ধমক দিয়ে ঘোলাটে চোখে লোকেশ তাকিয়ে রয়েছে। সরলা একটা জিনিস এতদিনে বুঝে গেছে, কোন রকম প্রতিবাদ বা আপত্তি এই সময় করা উচিত নয়। করলে মারাত্মক ফল ফলবে, লোকেশ আরও ভয়াবহ হয়ে উঠবে। সে ব্লাউজ খুলল। আঙুল নেড়ে লোকেশ ইশারা করল ব্রেসিয়ারটাও খোলার জন্য।

'আসলে কি জান'। লোকেশ এগিয়ে এল। টলছে না। কিন্তু কথাগুল জড়ান। 'আমার মেশিনের একটা পার্টসও আমি খারাপ হতে দেব না। আমি ঠিকমত সবকিছু মেইনটেইন করব। দরকারের সময়ে, প্রাণ নিয়ে টানাটানির সময়ে তুমি যে বলবে মেশিন খারাপ হয়ে গেছে, তা আমি বলতে দেব না। হুঁ হুঁ বাব্বা, আমি অনেক চালাক, আমি শিবেন্দ্র লাল নই। আমার মেশিন জাপান থেকে তৈরি করে আনবে বিটু। মাই অনলি সান। খুলেছ?'

লোকেশের চোখ দুটো ছোট হয়ে এসেছে। কথা জড়িয়ে যাচ্ছে। সরলার দুই কাঁধ ধরে সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে।

'হাউ আই লুক, কেমন দেখাচ্ছে আমাকে, ন্যাড়া লোকেশকে? তুমি কি জান আমরা কি করেছি?'

'কিছু করিনি।'

'বলছ?'

'হ্যাঁ।'

'আমার মেশিন ঠিক আছে, চলছে পারফেক্ট?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে বলছ কেন আজকে নয়?'

সরলা চুপ।

'তাহলে একটা কথা জেনে রাখ, কিছুই থেমে থাকে না, বন্ধ থাকে না। তুমি কি রোজ রাতে বাবাকে শ্রদ্ধা জানাতে ব্রেসিয়ার পরে ঘুমোবে? নিশ্চয় নয়, তাহলে বুঝব মেশিন কাজ করছে না।' লোকেশের ঘোলাটে দৃষ্টি কিছুই দেখতে পারছে না। চোখ বড় করে প্রাণপণে দেখার চেষ্টা করতে করতে সরলার গালে, কাঁধে এবং বুকে হাত বুলিয়ে বললো, 'আমার ছাড়পত্র আছে। কিন্তু বাবাকে বাঁচবার জন্য--- শুধু তখনই মেশিন খারাপ হয়ে যায়। আশ্চর্য।'

বলতে বলতে লোকেশ সরলাকে টানতে টানতে নিজে খাটের উপর গড়িয়ে পড়ল। সরলা তার মুখের উপর ঝুঁকে বলল, 'এবার শান্ত হও, ঘুমোও।'

'অবশ্যই, অবশ্যই ঘুমাব। কিন্তু শাস্তি পেতে হবে। ভগবান সব দেখছে, সব জানে। হোম, যজ্ঞি, স্বস্তয়ন,

শালা সব বোগাস।' আচমকা ধড়মড়িয়ে উঠে বসল লোকেশ। সরলা ভয়ে এক পা পিছিয়ে গেল।

'তুমিও শাস্তি পাবে, ভগবান সব জানে। ইউআর কোলাবোরেটর, হাত মিলিয়েছিলে।'

'আমি মেশিন খারাপ হওয়ার কথা বলিনি। এটা তোমার মাথা থেকে বেরিয়েছিল।'

'কিন্তু বারণও তো করোনি। চাঁদু, হারামজাদা চন্দনগড়াই বিশ্বাস করেছে, তুমিও কি করেছিলে? মিথ্যে কথা বল না, করেছিলে?'

'না।'

'তাহলে এস।'

সরলার কাঁধ ধরে লোকেশ হ্যাঁচকা টান দিল। খাটের উপর সরলা চিৎ হয়ে পড়ে যেতেই পায়ের কাছ থেকে শাড়িটা কোমর পর্যন্ত তুলে লোকেশ হুমড়ি খেয়ে পড়লো বুকের উপর এবং নিথর হয়ে রইল। তার বড় করে নেয়া শ্বাস-প্রশ্বাস এখন স্বাভাবিক হতে শুরু করল।

মিনিট দশেক পর বেহুঁশ লোকেশকে বিছানায় লম্বা করে শুইয়ে দিয়ে সরলা তার পাশে শুলো। ভোর রাতে ঘুম না আসা পর্যন্ত সে অনেক কিছু ভাবল এবং অবশেষে নিশ্চিন্ত হল, লোকেশ এবং সে ঠিকই আছে। সংসারে অনেক কিছুই ঘটে, সবই সাময়িক, কেউ তা মনে করে রাখে না।

সত্যিই কেউ মনে করে রাখেনি। সকালে ঘুম থেকে উঠে লোকেশ বলেছিল, 'ঘুমটা ডিপ হয়েছিল, বেশ ঝরঝরে লাগছে শরীরটা, আর এক কাপ চা খাব।'

সরলা সুখ বোধ করল লোকেশকে প্রতিদিনের মতো স্বাভাবিক দেখে। এই সুখবোধ নিয়ে কয়েকটা বছর স্বাচ্ছন্দ্যে কাটল।

বিটু মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম ডিভিশনে পাস করেছে। ফল বেরোনোর পরের দিনই বিকেলে ছেলেকে নিয়ে তপু হাজির। হাতে বাক্সভরা সন্দেশ। সরলা তো অবাক আনন্দে শুধু তাকিয়ে রইল।

'সরলাদি কত বছর পর এলাম বলতো?'

'বিটু তখন ক'দিনের মাত্র। নার্সিং হোম থেকে সবে ফিরেছি। আমার মা তখন এখানে। সতেরো বছর, না না বিটুর এখন ষোল বছর তিন মাস। এইটি তো ছেলে? বয়স কত, নাম কি? ভারি মিষ্টি মুখখানি তো।' সরলা ছেলেটিকে কোলে টেনে নিয়ে কপালে চুম্বন দিল।

'ওর নাম প্রতাপাদিত্য রায়, ডাক নাম তাপা, তপুর সঙ্গে মিলিয়েই। বয়স ছয়।'

'চোখ দুটো ঠিক তোর মতই হয়েছে।' বলেই তাকাল তপুর চোখের দিকে এবং তখনই খেয়াল করল, তপুর সিঁথেয় সিঁদুর নেই।

সরলার মুখভাব বদলাতেই তপু বলল, 'তাপার দু'বছর বয়সে ওর বাবা মারা গেছে। অফিস থেকে স্কুটারে বাড়ি ফিরছিল। কালকাজির কাছে একটা সার্কেল ঘোরার সময় মোটরে ধাক্কা লাগে। হাসপাতালে তিনদিন কোমায় থেকে মারা যায়।'

তপু খুব সহজ গলায় যেন অন্য কারুর বৈধব্যের খবর জানাল। চোখ-মুখে শোক বা বিষণ্নতার কোনো স্পর্শ নেই। সরলা ফাঁপরে পড়ল। সে নিজে কত পরিমাণ বেদনাহত হবে তপুকে দেখে আন্দাজ করতে পারছে না। তপু সেটা লক্ষ্য করল।

'সরলাদি, চার বছর হয়ে গেছে। শোক-তাপ যা করার এতদিনে করে ফেলেছি। এখন সামনের দিকে তাকিয়ে আমার চলতে হবে। দিল্লি বরাবরের জন্য ছেছে চলে এসেছি।'

'য়্যাঁ! তোর শ্বশুর বাড়িতো ওখানেই, ছেড়ে দিয়ে কোথায় এলি?'

‘মেয়েরা যেখানে যায়, বাপের বাড়ি। আমার ক্ষেত্রে দাদার বাড়ি। বাঁশবেড়ে।’

‘সেখানে তো ভাজ-এর সঙ্গে বনিবনা হত না।’

‘মনে আছে তোমার? হ্যাঁ, হয়নি, এখনো হয় না। তবে টাকা দিয়ে থাকি তো! আসলে অন্য কোথাও ঘর নিয়ে থাকার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু তাপাটা এত ছোট, আলাদা কোথাও থাকতে ভরসা হয় না। সারাদিন একটা ওইটুকু ছেলে একা থাকবে।’

‘তাহলে সারাদিন তুই কি করিস?’

‘চাকরি, অ্যাসোসিয়েটেড ব্যাংকে।’

তাপা ইতোমধ্যে গুটি গুটি বারান্দায় চলে গেছে। রাবারের বল নিয়ে ফুটবল খেলা হচ্ছে রাস্তায়। তপু বারান্দায় গিয়ে তাকে বারণ করে এল না ঝুঁকতে।

‘বৌদি চা করে আনব?’ দরজার কাছে থেকে চাঁদু বলল। তপু অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘এই তোমার সেই চাঁদু না? ওরে বাবা কত বড় হয়ে গেছে গো। রীতিমত একজন ম্যান, জেনটলম্যান। প্রথমদিন আমাকে বলেছিল বৌদি বিশ্রাম করছেন?’ তপু হেসে উঠল শব্দ করে। ‘এখনো ওইভাবে কথা বলে?’

চাঁদু চোখ নামিয়ে লাজুক হাসল। ‘সরলা বলল, ‘বলে না আবার। ওর দাদা যতক্ষণ বাড়ির বাইরে ততক্ষণ ওর কর্তামি চলে বাড়ির সবার উপর।’

‘চা আনব?’ চাঁদু সন্দেশের বাক্সটার দিকে তাকাল। ‘ওটা ফ্রিজে তুলে রাখি?’

‘তপুর ছেলেকে দে, তপুকেও দে।’

‘না না আমায় নয়, মিষ্টি খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি, দেখছ না কি রকম মোটা হয়ে গেছি।’

এবার সরলা ভাল করে লক্ষ্য করল তপুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। একটু ভারি হয়েছে। ঘাড়ে আর গলায় সামান্য চর্বি, কোমরটাও আর পাতলা নয়। অমলার বন্ধুর কতই বা বয়স হবে। তার থেকে তিন-চার বছরের ছোট। হালকা লিপস্টিকটাই যা বেমানান মনে হচ্ছে, যেহেতু তপু বিধবা। এটা ওর উচিত হয়নি। কিন্তু ওর সারা অবয়বে, বিশেষ করে দুটি চোখে কেমন একটা ছেলেমানুষী চাপল্য ছটফট করে চলেছে, যেটা ওর সাদামাটা রূপের উপর একটা সৌন্দর্যের প্রলেপ দিয়েছে। বয়সটাও যেন তার ফলে কম কম দেখাচ্ছে। ঝরেঝরে, সহজ, ন্যাকামোবর্জিত কথাবার্তা, যার মধ্য দিয়ে ওর নিজের উপর ভরসা আর বুদ্ধি ফুটে বেরিয়ে আসে, এটাই বোধহয় ওর ব্যক্তিত্ব যা প্রবলভাবে পুরুষদের টানে। সরলার মনে হল, টানবার এই ধরনের ক্ষমতা তার মধ্যে নেই। ‘তুই মোটা হয়ে গেছিস কিরে? কি চমৎকার ফিগার তোর, দেখলে...’

‘থাক থাক সরলাদি থাক, আর আমাকে গাছে চড়িও না। তোমার পাশে আমি? কতো হলো তোমার চল্লিশ ছুঁয়েছে? শেষ যা দেখেছি তার থেকেও সুন্দরী হয়েছ।’

‘তপু বাজে কথা বন্ধ করতো।’ আপ্লুত সরলার মুখ পুলকে ভেসে গেল।

‘দেখো বাপু আমি পুরুষ হলে তবু ধরে নেয়া যেত তোমাকে পটাবার জন্য বলছি। কিন্তু একটা মেয়ে যখন আর একটা মেয়ের রূপের প্রশংসা করে, তখন কত জ্বালা, কত ঈর্ষা দমিয়ে রেখে যে তা করে সেটা কি তুমি জেনেছ কখনো?’

শিবেন্দ্র লালের ঘরটা দেয়াল তুলে দুটি ঘর হয়েছে। একটি বিটুর শোবার, অন্যটি একাধারে বসার ও খাবার ঘর।

এখানেই রয়েছে কালার টিভি সেটটা আর দর্শকদের জন্য সোফা।

‘ডাইনিংয়ে চা দিয়েছি, আপনারা আসুন।’ চাঁদু কেতাদুরস্তভাবে ঘোষণা করল।

‘চল খাবার ঘরে যাই।’ সরলা কুনুই ধরে তপুকে নিয়ে এল।

টেবলে টি-পট, পেয়ালা ইত্যাদি সাজিয়ে রাখা এবং প্লেটে সিঙ্গাড়া ও রাজভোগ। তপু ধরে নিয়েছিল তার আনা সন্দেশই তাকে দেয়া হবে। চাঁদু নিজেই এটা করেছে।

'আপনার ছেলেকে আমি বারান্দাতেই দিয়ে আসছি।' চাঁদু আর একটা প্লেট নিয়ে বেরিয়ে গেল।

'তুমি খুব ভাগ্যবতী সরলাদি, তাই এমন গৃহিণী পেয়েছ। কতদিন হল রয়েছে?'

'আমার বিয়ের আগে থেকেই রয়েছে। তিনকূলে কেউ নেই, যাবেই বা কোথায়! লেখাপড়া একটু-আধটু আমিই ধরে-করে শিখিয়েছি। চেহারাটা ভাল, বাইরের লোকজনের সামনে বের করা যায়, নইলে বুদ্ধিশুদ্ধিতে গবেট। যাগগে এসব, তোর ব্যাংকটা কোথায়, কতদিন চাকরি কচ্ছিস?'

'আমার ব্যাংক কাঁকুড়গাছিতে। দিল্লির রাজিন্দর ব্যাংক থেকে সোজা বদলি হয়ে এখানে এসেছি। ও মারা যেতে ব্যাংক আমায় চাকরি দিল। অবশ্য চাকরি আমিই চেয়েছিলাম। তোমায় বহুদিন আগে লিখেছিলাম, শ্বশুর বাড়ির সঙ্গে আমার মতের বা মনের মিল হচ্ছে না। চাকরি নেয়ায় ওদের সবার আপত্তি ছিল, কিন্তু জোর করেই আমি নিই। ঝগড়াঝাটি শুরু হল। বাড়ির বৌ তাও আবার বিধবা, চাকরি করলে ওদের মান-মর্যাদা ধুলোয় গড়াগড়ি দেবে। আমি বললাম দেয় তো দেবে। অসহ্য হয়ে উঠতে শেষকালে জানালাম এখানে আর থাকব না, দাদার কাছে চলে যাব। ওরা রাজি হল তবে শর্ত দিল, একটা জিনিসও সঙ্গে নিয়ে যেতে পারব না, এমন কি বিয়ের গহনাগুলোও নয়। আমি তাতেই রাজি হয়ে গেলাম'।

'গহনা তো দশ ভরির, ছেড়ে দিয়ে এলি'। সরলা বিশ্বাস করতে পারছে না তপু এমন বোকার মত কাজটা কেন করল।

'ওরা বলল, 'তাপাকে যদি নিয়ে যেতে চাও তাহলে গহনা পাবে না। কাজেই সোনা ফেলে দিয়েই চলে এলাম। অবশ্য চলে আসাটা বলার মত এত সহজ ছিল না। দিল্লী থেকে বদলী হতে পেরেছি বলেই আসা হল। অ্যাসোসিয়েশনের দিল্লী ইউনিটের সেক্রেটারী ভদ্রলোক আমার জন্য তদ্বির লেখালেখি করে এটা করিয়েছেন। প্রথমে এক বছর ছিলাম দমদম নাগের বাজারে। কি কষ্ট করে যে বাঁশবেড়ে নাগের বাজার দুবেলা করতে হত কি বলব তোমায়'। কথা বলতে বলতে তপু সিঙ্গারা ভেঙ্গে খেয়ে যাচ্ছিল। সরলা লক্ষ্য রাখছিল প্লেটে।

'রাজভোগ দুটো শেষ করবি কিন্তু। একদিন খেলে মোটা হয়ে যাবি না। তাহলে তোর উপর অনেক ধকল গেছে'।

'নাগেরবাজার ব্রাঞ্চে এক নতুন অফিসার সোমনাথ কয়াল, অনেক চেষ্টা চরিত্র করে বাঁশবেড়ের দিকে একটু ঠেলে দিতে পেরেছে। তাতে মিনিট কুড়ি সময় কমেছে। তবে আমি কাঁকুড়গাছির দিকে যদি ফ্ল্যাট পাই এখুনি চলে আসব। তাপার লেখাপড়ার দিকটা আগে দেখতে হবে তো'! তপু আস্ত রাজভোগ মুখে পুরে চিবোতে চিবোতে বলল, 'সত্য নারায়ণনের'?

হ্যাঁ

'মনে আছে সরলাদি তোমার কাছে নীচের ঘরটা ভাড়া চেয়েছিলাম? দেখ আজও ঘর খুঁজে যাচ্ছি'। তপুর মুখে হাসি ছড়িয়ে পড়ল।

'দালাল লাগা পেয়ে যাবি'।

'সোমনাথকে একজন একটা ফ্ল্যাটের সন্ধান দিয়েছে, ব্যাঙ্কের কাছাকাছি, সেটাই এখন দেখতে যাব। ও মানিকতলার মোড়ে অপেক্ষা করে থাকবে ছ'টার সময়'। তপু ঘড়ি দেখল।

সরলার কানে 'সোমনাথ' নামটা খট করে কানে বাজল। আগের ব্রাঞ্চের অফিসার চেষ্টা চরিত্র করে বদলীতে সাহায্য করেছে, ল্যাঠা তো এখানেই চুকে গেল। এর পর ঘর দেখে দেওয়াতেও উৎসাহ কেন? এত আঠা কিসের?

'কত ভাড়া কিছু বলেছে'?

‘চার হাজার। সেলামি নেবে না। দুখানা ঘর, ডাইনিং স্পেস, বারান্দা, দুটো বাথরুম, চারতলায়’। ঝর ঝর করে তপু বলে গেল ফর্দ পড়ার মত স্বাভাবিক স্বরে।

‘চার হাজার! এত টাকা। কত মাইনে পাস যে অ্যাত ভাড়া দিবি’?

‘একার হলে পারতাম না, দুজনের টাকায় পারব’।

‘দুজন, আর একজন কে’? সরলার কাছে অন্য জনটি এখন আন্দাজের আওতায় আসছে। সে রোমাঞ্চ বোধ করল।

‘সোমনাথ’। তপুর চোখ উজ্জ্বল হয়েছে। চেয়ারে নড়ে বসে সে মিটমিট হাসল। সরলা নিজেকে যথাসম্ভব শান্ত দেখাবার চেষ্টা করল।

‘তোরা বিয়ে করবি’?

‘হুঁউ। জানি এবার কি বলবে। ওদের দেশ ক্যানিংয়ের কাছে তালদিতে। সেখানে বাবা মা ভাই বোন সবই আছে। বিধবা বিয়েতে তাদের ঘোরতর আপত্তি তো বটেই, এক পয়সা পাওনা থোওনা হবে না এটাই ওদের মাথা খারাপ করে দিয়েছে, আমার দাদারও প্রচণ্ড আপত্তি সোমনাথ নিচু জাত বলে। তাছাড়া বিধবা বোন প্রেমট্রেম করাতেও তিনি লজ্জিত। অতএব আমরা নিজেরাই ঠিক করলাম’। তপু সুর করে গেয়ে উঠল, ‘একলা চল, একলা চল একলা চলরে’।

‘সোমনাথ দেখতে শুনতে কেমন, শিক্ষা-দীক্ষা, বয়স, কালচার? তোর সঙ্গে মিলবে’?

‘বয়স আমার সমান, দুমাসের ছোটই। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আর সেন্ট জেভিয়ার্সে পড়েছে। কথার মাঝে মাঝে কখনো টান বেরিয়ে পড়ে। ভ্যাঙাতে গিয়ে আমার কথাতেও টান এসে যাচ্ছে। এছাড়া দেখতে শুনতে খুবই সাধারণ, তোমার চাঁদুকেও ওর পাশে উত্তম কুমার মনে হবে।’

‘তাপাকে নিয়ে কোন সমস্যা হবে না’?

বিন্দুমাত্র না। তাপা নিজের বাবাকে প্রায় ভুলেই গেছে আর সোমনাথের সঙ্গে ভালই বন্ধুত্ব হয়েছে। দু’জনে দু’জনকে পছন্দও করে খুব’।

‘সোমনাথ নিজের সন্তানতো চাইতে পারে’। সরলা উদ্বিগ্ন চোখে তাকাল। ‘তুই লাইগেশন করিয়ে নিয়েছিস’?

‘না। আর চাইতে পারে বলছ কি? আমি বলেছি’– তপু বাঁ-হাতের তর্জনীটা উঁচিয়ে ধরল। ‘এর বেশি নয়। ও বলেছে’ তপু তিনটি আঙুল ওঠাল।

সরলা থ হয়ে রইল। তার আজন্ম পোষিত বোধ থেকে সে তপুকে বুঝে উঠতে পারছে না। এটা ওর সাহসের না বেহায়াপনার, প্রশংসার না নিন্দার কোন ধরনের কাজ, সেটা তার ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থেকে যাচ্ছে। গল্প উপন্যাসে কি সিনেমায় এই ধরনের ব্যাপার সে পেয়েছে, কিন্তু সত্যি সত্যিই একটা মেয়ে যে এমন ব্যাপার ঘটাবে, তার সামনে বসে অনায়াসে স্বাচ্ছন্দ্যে বলে যাবে এতটা সে ভাবতে পারছে না।

‘তোরা এই নিয়ে আলোচনা করেছিস তাহলে’।

‘নিশ্চয়’।

সরলার মনে পড়ল দেশবন্ধু পার্কে লোকেশের সঙ্গে পরিচিত হবার সময়, মলিই কথাটা তুলেছিল, ‘আপনি কটা ছেলে মেয়ের বাবা হতে চান?’ লোকেশ সরাসরি স্পষ্ট কোন জবাব দেয়নি, হালকা চালে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেছল।

ধুপ ধাপ সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল।

‘মা, মা’ বলতে বলতে ঢুকল লম্বা চওড়া এক কিশোর, চোখে চশমা। তপুকে দেখে থমকে সরলার দিকে তাকাল।

‘আমার ছেলে বিটু। এবার মাধ্যমিক পাস করল ফার্স্ট ডিভিশনে। তোর মাসি হয়, তপু মাসি’।

বিটু হাত তুলে নমস্কার করল, তপুও তাই করল। পলকের জন্য সরলার মুখ নিষ্প্রভ দেখাল। ‘তপু দিল্লীতে থাকত, এখন কলকাতায়, ব্যাঙ্কে চাকরি করে। ওর ছেলে তাপা– দ্যাখ তো বারান্দায় ঝুঁকছে কি-না?’

‘ঝোঁকেনি, আমি নজর রেখেছি’। ঘরের বাইরে থেকে চাঁদুর গলা শোনা গেল।

‘মা’, রাজেশ, বাপ্পা, শান্ত সব মোটরে ওয়েট করছে, ট্যাংরায় চায়না টাউনে খেতে যাব। চট করে একটু বাইরে এস বলছি’। বিটু দ্রুত ব্যস্ত গলায় বলল।

‘তপুর সামনেই বল না, টাকা চাই তো’?

‘হ্যাঁ’

‘কত’?

‘দু’শ’ দাও। চাঁদা করে বিল দেব’।

‘এই সেদিন একশ’ দিলুম, পরশুইতো, আজ আবার’। বিটু গলা জড়িয়ে ধরায় কথা অসমাপ্ত রেখে তপুর দিকে তাকিয়ে সরলা সত্যন্ত সুখের হাসি হাসল।

‘সরলাদি আমি এবার উঠি। ছ’টার সময় সোমনাথ অপেক্ষা করবে’।

‘আবার করে আসবি? দাঁড়া একটু, টাকাটা দিয়ে দি’ ছেলে তো নয় কাবুলিওয়ালা’।

টাকা নিয়ে বিটু ছুটে নিচে নেমে গেল। তপু বলল, দেখে কে বলবে বয়স ষোল সতেরো। এই বয়সী এমন বড় চেহারার ছেলে আরও কয়েকজন চোখে পড়েছে।

জেনারেশনটার গ্রোথ খুব ভাল হয়েছে।

‘সব জেনারেশনেই গ্রোথ ভাল হয় যদি একটাই সন্তান হয়, বাবা দুবেলা মাছ-মাংস, দুধ-মাখন খাওয়ায়। ছেলের স্বাস্থ্য আর ফিগার ঠিক রাখার জন্য তোর জামাইবাবু যা করে’।

‘শুধু ছেলের জন্যই? বৌয়ের বয়স তো আঠারো বছর ধরে তিনি দাঁড় করিয়ে রেখেছেন। আসি এবার, তাপা এসো’।

সিঁড়ি ধরে নামতে নামতে তপু দাঁড়াল। ‘সরলাদি আমাদের বিয়েতে তুমি উইটনেস হবে? আত্মীয়-স্বজন তো কেউ আসবে না, তুমি এলে বলতে পারব দিদি এসেছে’।

সরলা প্রস্তাবটা শুনেই কুঁকড়ে গেছল। ‘দিদি এসেছে’ কথাটা হৃদয়ের অনেক ভিতরে ঢুকে একটা বিস্ফোরণ ঘটাল।

‘কবে বিয়ে তোদের’?

‘এই মাসে নোটিশ দেব, সামনের মাসেই ঠিক করেছি’।

‘বলিস’। সরলা হাত রাখল তপুর কাঁধে।

সন্ধ্যাবেলায় খাবার ঘরে সোফায় হেলান দিয়ে সরলা টিভিতে বাংলা সিরিয়াল দেখছিল। খাওয়ার টেবিলের চেয়ারে বসে চাঁদু। অফিস থেকে ফিরে পায়ের শব্দ না করে লোকেশ দোতলায় উঠে খাবার ঘরের দরজায় দাঁড়াল।

তাকে দেখেই চাঁদু চেয়ার থেকে উঠে পড়ল। সরলা সোজা হয়ে বসে বুকের কাপড় ঠিক করে বলল, ‘এই মাত্র শুরু হল, দেখবে নাকি’।

‘না। চা দাও’। লোকেশ শোবার ঘরের দিকে গেল। সরলা তাকে অনুসরণ করল।

চাঁদুকে চেয়ারে বসার পারমিশন কে দিয়েছে? ওকে চেয়ারে পাশে বসিয়ে গা এলিয়ে তুমি টিভি দেখছ'?

লোকেশ বিরক্তি ও ক্ষোভ জানাতে হাতের অ্যাটাচি কেসটা বিছানায় ছুঁড়ে বারান্দার পর্দার দিকে তাকিয়ে ভ্রু কোঁচকাল। 'পই পই করে বলি পর্দাটা ঠিক করে টেনে রাখবে, সামনের বাড়ির সারকেলটা তো হাঁ করে ঘরের দিকে তাকিয়ে থাকে'।

সরলা কথা বলল না। এই ধরনের কথায় সে অভ্যস্ত। প্রতিদিনই লোকেশ অফিস থেকে ফিরেই কিছু না কিছু ত্রুটি বার করে ধমক ধামক শুরু করবে। সরলা পর্দাটা টেনে দিয়ে বলল, 'আমি তো খাবার ঘরে, তাহলে এ ঘরের দিকে তাকিয়ে চোখ ব্যথা করবে, এমন বোকা কেউ নেই'।

'আছে কি নেই, তুমি আর কি জান'? লোকেশ মুখ নিচু করে জুতোর ফিতে খুলছে। তাকাল না সরলার দিকে। 'চান করেই আমি বেরোব, ভটচাযের কাছে যাব, ওকে নিয়ে যাব হোটেল হিন্দুস্থানে। আমাদের এক ডিরেক্টর এসেছে'।

'খেয়ে ফিরবে'?

'বলতে পারছি না। হয়তো খেয়েই ফিরব'।

লোকেশ পাজামা পরে খাটে বসেছে, চা দিয়ে চাঁদু বেরিয়ে গেল। তখন সরলা বলল, 'আজ কে এসেছিল জান? সেই তপু। মনে আছে ওকে। সেই যে আমাকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে গেছল, তার পর বাঁশবেড়েতে চলে গেল'।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওর তো দিল্লিতে বিয়ে হয়েছিল। একটা চিঠি লিখেছিল, শ্বশুর বাড়ী নাকি খুব কনজারভেটিভ... মেয়েদের এই এক বাঁধাবুলি শ্বশুর বাড়ির লোকেরা পাজি, বদমাস। হুট হাট বেরোতে দেয় না, ঘরের কাজকর্ম করতে বলে, ঝিয়ের মত খাটায়'।

'কথাটা অনেকটাই তো সত্যি, এই তো পাশের বাড়ির রঞ্জনাকেই তো দেখছি'।

'থাক ওর কথা আর বোল না। আমরা এখন যে কথা বলছি, তুমি কাল জিজ্ঞাস কোরো, দাড়ি-কমাসমেত সব তোমার বলে দেবে'। লোকেশ হাসল। কয়েক বছর হল তার হাসি কমে এসেছে, যেমন চাঁদি থেকে চুল ঝরে টাক জেগে উঠছে। 'মনে পড়ে, বাবার শ্রাদ্ধের পর রাতে মদ খেয়েছিলাম। সেই অতরাতে বারান্দায় কান খাঁড়া করে উনি শুনেছিলেন। ওর হাজব্যান্ডটাও তেমনি'।

'তপুর স্বামী মারা গেছে, ও বিধবা হয়ে ছেলেকে নিয়ে চলে এসেছে'। সরলা নিচু স্বরে বলল।

লোকেশ অপ্রভিত, হতভম্ভ। 'স্যাড, ভেরি স্যাড, কি হয়েছিল'? সরলা যা যা শুনেছে তপুর কাছে সবই বলল। কলকাতায় থাকার জন্য ফ্ল্যাট খুঁজছে, কিন্তু কেন খুঁজছে, তার পুরো কারণটা বলল না। তার মনে হল তপুর আবার বিয়ে করার ব্যাপারটা এখন না বলাই ভাল।

স্নান করতে যাওয়ার সময় লোকেশ আলগাভাবে বলল, 'বয়স তো বেশি নয়, পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ, মেয়েদের এই বয়সটায় অ্যাট্রাকটিভ দেখায়, ওকে একটু সাবধানে থাকতে বল'।

ক'দিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছে। দুপুরে কিছুক্ষণের জন্য ধরে আবার শুরু হয় বিকেলে। রাস্তার দিকের বারান্দার রেলিংয়ে ভিজে তোয়ালেটা মেলে দিয়ে সরলা দাঁড়িয়ে রয়েছে। এক বাসনওয়ালী স্টিলের বাসনের ঝুড়ি মাথায় আর পুরনো কাপড়ের পোঁটলা পিঠে নিয়ে এগিয়ে আসছিল। পুরনো শাড়ি জামা প্যান্ট কিছু জমেছে, যদি একটা বড় ঢাকনাওলা বাটি পাওয়া যায়, এই আশা নিয়ে সরলা দাঁড়িয়ে।

'ওম্মা, সকাল থেকে দুবার আমি বারান্দায় ঘুরে গেছি'। রঞ্জনার কথা শুনে সরলা ঘুরে দাঁড়াল।

'কেন'?

'সে কিরে, আজকের কাগজ দেখিসনি'?

‘না, দুপুরের খাওয়ার পর দেখি’।

‘দেখ দেখ, তাড়াতাড়ি দেখ, একটা কি অদ্ভুত রকমের খবর বেরিয়েছে’।

‘কি খবর’! সরলা অবাক হল এবং অস্বস্তি বোধ করল। বাড়িতে ইংরেজি কাগজ নেওয়া হয় কিন্তু ভাষাটা সে ভাল বুঝতে পারে না বলে ছবিটবি দেখে রেখে দেয়। তার বিএ পড়ার বিদ্যে নিয়ে খবরের কাগজের ইংরেজি থেকে অর্থোদ্ধারের কাজ যথেষ্ট কষ্টসাধ্য ব্যাপার। সে কষ্ট করতে অনিচ্ছুক, কেননা দুনিয়ার খবর না জেনেও সে সুখেই আছে।

‘সরলা দত্ত নামে একটা বৌ খুন হয়েছে’।

‘আমার নামে? অদ্ভুত তো’!

‘কাগজটা দেখ, খুব বড় বড় করে আমাদের কাগজে হেডিং দিয়েছে। আমি তো ভেবেছি তুই পড়েছিস। আর শুধু কি নামেই মিল, আরও মিল আছে’।

সরলা প্রায় ছুটে ঘরের মধ্যে এসে খবরের কাগজ খুলল। খুনের ইংরেজি মার্ডার। সে বড় বড় হেডিং-এ মার্ডার শব্দটা খুঁজল। পাতার পর পাতা উল্টে, তন্নতন্ন করে খুনের খরব পেল মাত্র দু’টি। পরে বুঝল একজন গুন্ডা তার আগের দলের হাতে ছুরি খেয়ে মরেছে আর গ্রামে জমিজমা নিয়ে বিবাদে ভাইপোর হাতে কাকার মুণ্ড ধড় থেকে খসেছে। কোথায় সরলা দত্ত নামে বৌ?

খবরটা খুঁজে না পেয়ে সরলার কৌতূহল বেড়ে গেল। সে বারান্দায় এসে ঝুঁকে রঞ্জনাদের ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়ে ওর ছোট মেয়েকে দেখতে পেল। ‘এই গোবি তোর মাকে একবার ডাক তো’।

কিছুক্ষণ পর রঞ্জনা এল।

‘তোদের কাগজটা দে, আমাদের ইংরেজি কাগজে খবরটা নেই’।

‘আমাদের কাগজ এখন ভাসুরের ঘরে, ওর পড়া না হলে এখন দিতে পারব না’।

‘কি লিখেছে কি? কি মিল আছে’।

‘মিল মানে সরলা দত্ত নাম, বয়স চল্লিশ, দেখতে সুন্দরী, একমাত্র ছেলে উচ্চ মাধমিক পড়ছে, বাড়িটা আমাদের এই শ্যামপুকুর থানার এলাকাতেই, আর–’ রঞ্জনা থেমে গেল। পিছনে ঘরের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে, বারান্দায় ঝুঁকে, উত্তেজিত নিচু গলায় বলল, খুন করেছে বাড়ির চাকর, দুপুরে গলা টিপে মেরেছে’।

রঞ্জনার চোখে-মুখে, বলার ভঙ্গিতে কি যেন একটা ইঙ্গিত সরলা দেখতে পেল। তার মাথা মুহূর্তের জন্য ঘুরে গেল।

‘শোবার ঘরে বিছানায় ছায়া ছাড়া এক টুকরো কাপড়ও ছিল না। ধস্তাধস্তির মত চিহ্ন অবশ্য বিছানায় ছিল তবে সেটা কিসের ধস্তাদস্তি, কে জানে’। রঞ্জনা এক চোখ টিপে ঠোঁট উল্টাল। ভ্রূ তুলল। আর একবার পিছন ফিরে সন্তর্পণে ঘরের দিকে তাকিয়ে নিল। আরো ঝুঁকে ফিসফিস করল, ‘ছোকরা জোয়ান চাকর’।

সরলার মুখ থেকে রক্ত সরে গেছে। হাসার চেষ্টা করল। ‘সকালে উনি কাগজ পড়তে পড়তে আমায় ডাকলেন। ছেলেমেয়েদের সরিয়ে দিয়ে বললেন, এই দ্যাখো। আমার তো পড়েই হাত-পা পেটে সিঁধিয়ে গেল। উত্তর কলকাতা, শ্যামপুকুর থানার অধীন, এক ছেলের মা, বয়সটাও মিলছে, দুপুরে একা আর বাড়িতে শুধু চাকর। খুন করেছে যে সেও পুরনো চাকর, তবে ছ’বছরের পুরনো। উনি ঠাট্টা করে বললেন, এত মিল তার উপর নামটাও একই, দ্যাখোতো একবার উঁকি দিয়ে উনি বেঁচেটেচে আছেন কিনা। আমি বললুম পাশের বাড়িতে দুপুরে এমন কাণ্ড ঘটলে পুলিশ আসবে, পাড়ায় জানাজানি হয়ে লোক জমে যাবে। সেসব কিছুই হয়নি। তাছাড়া বিকেলে আমি চাঁদুকে দেখেছি লন্ড্রি থেকে কাপড় নিয়ে বাড়িতে ঢুকতে’।

‘কাগজটা পড়া হলে আমায় একবার দিবি’।

সরলার এখন এক মুহূর্তও রঞ্জনার সামনে থাকতে ইচ্ছা করছে না। যে জিনিস কেউ কখনও ভাবে না, অনুমানও করবে না, সেই সব কথাই ও বলবে বা মাথায় ঢুকিয়ে দেবে।

ঘরে এসে সে খাটে শুয়ে পড়ল। মাথার মধ্যে একটা নাগরদোলা ঘুরতে শুরু করেছে। নানান মুখ, তাদের অভিব্যক্তি, তাদের কথাবার্তা ঘুরতে ঘুরতে উঠছে ও নামছে। কাগজের এই খবর লোকেশ পড়বে, বিটু পড়বে, পাড়ার লোকেরা বিশেষ করে জ্যাঠার বাড়ির লোকেরা পড়বে। বাবা মারা না গেলে নিশ্চয় পড়তেন। দাদা-বৌদিরা, মা, দিদি, জামাই বাবুরা এমন কি তপুও পড়বে।

সে বেঁচে আছে জেনে সবাই হাঁফ ছাড়বে ঠিকই কিন্তু একটা নোংরা সম্ভাবনা সবার মনের মধ্যে বোধ হয় এবার পাঁচড়া তৈরী করে দিয়ে গেল। অনেকদিন পর্যন্ত সবাই এটা নিয়ে গল্প করবে, এই আশ্চর্য মিলের কথার সঙ্গে সঙ্গে নোংরা একটা ছবি তাকে নিয়ে পলকের জন্য হলেও আঁকা হবে। ভাগ্য- একেই বলে ভাগ্য। সরলা বালিশে মুখ চেপে ধরল।

'ভাত দিয়েছি, ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে'। দরজায় দাঁড়িয়ে চাঁদু। সরলা জবাব দিল না।

রিসিভার তুলে 'হ্যালো' বলতেই লোকেশ ওধার থেকে বলল, 'আজকের কাগজে একটা খুনের খবর বেরিয়েছে, দেখেছ নাকি'?

সরলার গলা শুকিয়ে গেল, কোনক্রমে বলল, 'না তো।' 'আমিও জানতুম না ভটচায আমায় দেখাল।' থেমে কয়েক সেকেন্ড পর লোকেশ বলল, 'চাঁদু কি করছে ?'

'বলতে পারব না, আমি শুয়েছিলুম। মাথাটা ভীষণ ধরেছে।'

'আচ্ছা ঠিক আছে।'

ফোন রাখার পর সরলা ইতস্তত করল। লোকেশ জানতে চাইল চাঁদু কি করছে এবং কেন জানতে চাইল সেটা সে বুঝতে পেরেছে। ঘরের জানালা থেকে জ্যাঠামশাইদের ছাদ দেখা যায়। সে মুখ তুলে তাকাতেই বড়দার বড় মেয়ে অমিতা সরে গেল পাচিলের ধার থেকে। মেয়েটা আগে কখনো এই বাড়ির দিকে এইভাবে তাকিয়ে থেকেছে বলে তার মনে পড়ল না।

'সরলা, অ্যাই সরলা।'

রঞ্জনা বারান্দা থেকে ডাকছে। সরলা দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

'এইনে আধঘণ্টা পরে নেব। শ্বাশুড়ি পড়বে।'

কাগজটা হাতে নিয়েই সরলার মনে হল একটা কেউটে সাপ সে যেন ধরল। কাগজটা ভাঁজ করে খবরটা সাজিয়েই রাখা, খোঁজাখুঁজি করে বার করার আর দরকার হবে না। ভয়ে ভয়ে সে হেডিংয়ে চোখ রাখল।

উত্তর কলকাতায় গৃহবধূকে খুন

করে ধর্ষণ, গৃহভৃত্য পলাতক

স্টাফ রিপোর্টারের লেখাটি নাটকীয় ভঙ্গিতে শুরু হয়েছে ঃ প্রায় বিবস্ত্র সরলা দত্তর নিষ্প্রাণ দেহটিকে শোবার ঘরের বিছানায় প্রথম দেখতে পায় তার একমাত্র পুত্র উচ্চ মাধ্যমিক একাদশ শ্রেণীর ছাত্র পরিমল। ছুটির পর বাড়ি ফিরে খোলা সদর দরজা দিয়ে সে দোতলায় উঠে আসে। ভৃত্য বলাইকে দেখতে না পেয়ে সে নাম ধরে ডাকাডাকি করে, খাবার টেবিলে রাখা খাবার খেতে বসে যায়। খাওয়ার পর সে নিজের ঘরে যায়। তারপর সে মায়ের শোবার ঘরে গিয়ে দেখে বিছানায় মা সরলা চিৎ হয়ে শুয়ে, দেহে শুধুমাত্র সায়া ছাড়া আর কোন আবরণ নেই। মৃতার কানের পাশে রক্ত শুকিয়ে রয়েছে। সম্ভবত ভারী কিছু দিয়ে আঘাত করা হয়েছিল। মাকে এই অবস্থায় দেখে কিশোর পুত্র বিমূঢ় হয়ে যায়। তাড়াতাড়ি সে মেঝেয় পড়ে থাকা শাড়িটি দিয়ে মার দেহ ঢেকে দেয়।

সরলা চোখ বন্ধ করে ফেলল। কল্পনাতেও সে নিজেকে এই রকম অবস্থায় ভাবতে পারবে না। কিন্তু সে ভাবতে

না পারলেও অন্যরা তো পারবে। শুধু ছায়া পরিয়ে মুহূর্তের জন্যও একবার দেখার চেষ্টা করবে তার চেনাজানারা।

সে বাকিটুকু কি পড়বে? সরলা চোখ খুলল। পরিমল চিৎকার করতে করতে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। প্রতিবেশীরা, ছুটে আসেন। খবর পেয়ে শ্যামপুকুর থানার ওসি দ্রুত পৌঁছে যান। লাল বাজার থেকে আসেন মার্ডার স্কোয়াডের অফিসাররা। পুলিশের কুকুরও আনা হয় কিন্তু আঁততায়ীর হদিস করায় সে ব্যর্থ হয়। ভূপেন বসু অ্যাভিনুয়ের বাসস্টপে এসে কুকুরটি গৃহভৃত্যের গন্ধের খেই হারিয়ে ফেলে।

পুলিশের অনুমান, সম্ভবত হাওড়া স্টেশনে যাবার জন্য বলাই বাসে উঠে দক্ষিণ দিকে গেছে। তার বাড়ি মেদিনীপুর জেলার জোনাক গ্রামে। মৃতার স্বামী, এক মালটিন্যাশনাল সংস্থার উচ্চপদস্থ অফিসার নরেন বাবু জানালেন, ঘরের কোন জিনিসই চুরি হয়নি। মৃতার দেহের কোন গহনা খোয়া যায়নি। বালিশের নিচে আলমারির চাবি ছিল। আলমারি খোলা হয়নি। তিনি আরও জানান, বলাই ছ'বছর তাদের বাড়িতে কাজ করছে। নম্র এবং মার্জিত কথাবার্তার জন্য বাড়ির সবাই তাকে খুব পছন্দ করত। তিনি এখনো বিশ্বাস করতে পারছেন না যে, বলাই এমন কাজ করতে পারে।

প্রতিবেশী গোপেন সিকদার বললেন, বলাইকে তার চেহারা, কথাবার্তার জন্য অপরিচিতরা প্রথমে ধরে নিত সে দও পরিবারেরই কেউ। ওর চালচলনও ছিল সেইরকম। ওর মধ্যে এমন নৃশংসতা যে লুকিয়ে থাকতে পারে, বিশ্বাসের এমন জঘন্য প্রতিদান যে মানুষ দিতে পারে তা তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেন না।

প্রতিবেশিনী জয়শ্রী বসাক জানালেন, মৃতা সরলার সঙ্গে তার প্রায় পনেরো বছরের পরিচয়। সরলা অত্যন্ত শান্ত স্বভাবের এবং পতিঅন্তপ্রাণ বলতে যা বোজায় সেইরকম চরিত্রেরই মহিলা ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করেন না যে, বলাইয়ের সঙ্গে তাঁর কোন প্রণয়জনিত সম্পর্ক ছিল।

রাত্রে লাল বাজারের এক কর্তা বললেন, গহনা বা টাকা চুরি না হওয়ায় এবং ধর্ষণের আগে খুন করায় মনে হয় আঁততায়ী মানসিক বিকারগ্রস্ত। বলাইকে ধরার জন্য জোর তল্লাশ শুরু হয়েছে। কলকাতা থেকে গোয়েন্দা দল আজই মেদিনীপুর রওনা হয়েছে।

সরলা খুঁটিয়ে আর একবার পড়ল। বারান্দা থেকে রঞ্জনার ডাক শুনতে পেল। কাগজটা হাতে নিয়ে রঞ্জনা বলল, 'পড়লি ?'

'হ্যাঁ। এরকম খুন তো প্রায়ই হয়, এই নিয়ে অবাক হওয়ার কি আছে? সরলা স্বাভাবিক থাকার মত ভাব গলায় আনল।

'বলছিস কি, অবাক হব না? পুলিশ কি বলেছে সেটা পড়িসনি? লোকটার মানসিক বিকার ঘটেছিল, না হলে খুন করে তারপর একটা মরাকে এই জিনিস করতে পারে? অথচ লোকটা নম্র, মার্জিত, এই বলে স্বামীই তো সার্টিফিকেট দিয়েছে। সত্যিই বাবা, মানুষের বাইরেটা দেখে কিছু বোঝা যায় না। অত বছরের পুরনো চাকর আর তার মনের মধ্যে কিনা এই ছিল। ...এটাকে তুই হাল্কাভাবে নিতে পারিস, আমি পারব না।'

'আমি হাল্কাভাবে নিচ্ছি কে বলল? আমি বলেছি, অবাক হওয়ার মত ব্যাপার এটা নয়। রেপ তো হরদমই হয়, এটাও তাই। এক্ষেত্রে সরলা দত্ত হয়তো এমন বাধা দিয়েছিল যে শেষ পর্যন্ত তাকে খুন করে তবেই রেপ করা সম্ভব হয়েছে।'

'হ্যাঁ, সেটাই হওয়া সম্ভব, বাধা তো দিয়েছেই। কিন্তু ওই বলাই চাকরটার কথা ভাব। বাড়ির লোকের মত ব্যবহার পেয়েছে। ছ'বছর থেকেছে আর কিনা- উনি বলেছেন খোঁজ নিয়ে বার করবেন বাড়িটা কোথায়, ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে একজন ঠিকই বেরিয়ে পড়বে। যাই শ্বাশুড়ি এবার চেঁচাতে শুরু করবে।'

বিকেলে বিটু স্কুল থেকে ফিরল গম্ভীর মুখে। অন্যান্য দিনের মত প্রথমেই খাবার টেবিলে গিয়ে বসল না। নিজের ঘরে খাটে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। উদ্বিগ্ন হয়েই সরলা ছেলের কপালে তালু রেখে তাপ দেখল। কলকাতায় কখন যে কি অসুখ তৈরী হয় তার ঠিক আছে? আশ্বস্ত হল তাপ স্বাভাবিক অনুভব করে।

'শুয়ে পড়লি যে, খাবি না ?'

‘আজ কাগজে একটা খবর বেরিয়েছে’, বিটু শান্ত স্বাভাবিক গলায় বলল।

সরলার বুক ধক্ করে উঠল। ছেলের চোখে সে রাগ বা ক্ষোভ দেখল না, কেমন যেন আহত দৃষ্টিতে মায়ের দিকে তাকিয়ে।

‘হ্যাঁ পড়েছি।’

‘কি বিশ্রী, ভালবাসার স্টাইলে যে লেখে। পরনে শুধুমাত্র ছায়া, এটা কি খুব গুরুত্বপূর্ণ বলতে হবে?’ বিটুর স্বর তিক্ত। সে উঠে বসল। ‘এই নিয়ে বাপ্পা আর রাজেসের সঙ্গে আমার একচোট হয়ে গেল। ওরা বলছে রিপোর্টে এটা না জানালে, রীডাররা ক্রাইমের গুরুত্বটা বুঝবে না, ইমপ্যাকটটা জোরালো হবে না, এটা সেক্সকে সুড়সুড়ি দেওয়ার জন্য নয়... ব্লাডি শিট।’ বিটুর চোখ দুটো বড় হয়ে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

‘এইসব জিনিস নিয়ে তোরা তর্ক করিস কেন ?’

সরলা মৃদু ধমক দিল।

‘কাগজে লিখলে বহুলোক পড়ে, তাই নিয়ে আলোচনা, তর্ক হতেই পারে। কিন্তু ওরা ব্যাপারটাকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে গেল .... আমাদের বাড়িতে ক্লাসের অনেক ছেলেই তো এসেছে, তোমাকে, চাঁদু দাকে দেখেছে।’ বিটু ইতস্তত করে বলল ‘যত মাথাব্যথা ওদেরই।’

‘কি জন্য?’

‘এই দুপুরে তুমি বাড়িতে একা থাক।’ বিটু খাট থেকে দ্রুত নেমে কলঘরে চলে গেল। সরলা মনে মনে ভগবানকে ডাকল। শেষকালে ছেলের বন্ধুরাও কিনা সায়া পরা সরলা দত্তর দিকে উঁকি মারছে! কি লজ্জার।

লোকেশ অন্যদিনের থেকে একটু আগেই ফিরল। সরলা তখন দোতলায়। সে শুনতে পেল, নীচে রান্না ঘরের সামনে লোকেশ বলছে, ‘হ্যাঁ, তোর দেশের ঠিকানাটা কি? ... অ, ওপরে আয়, লিখে রাখব।’

উপরে এল লোকেশ। সরলা তীক্ষ্ণ নজরে মুখ ভাব লক্ষ্য করল। স্বাভাবিক। প্রতিদিনের মত অ্যাটাচিকেসটা খাটে ছুঁড়ে দিল। সরলা পিছনে এসে দাঁড়াতেই দুটো হাত পিছনে বাড়াল। সরলা কোটটা খুলে নিল। ‘উফফ আজ বড্ড ভ্যাপসানি। বৃষ্টি হলেই দেখছি কষ্টটা বেশি হয়’ টাই খুলতে খুলতে লোকেশ বলল।

‘ঠাণ্ডা ঘরে সারাদিন থাকলে একটু বেশিই লাগে। আমার তো অত লাগছে না।’ সরলা মনে মনে স্বস্তি বোধ করল। লোকেশ যে উগ্র মেজাজে সরলা দত্ত খুন নিয়ে কথা শুরু করেনি, এটাই এখন তার ভাল লাগছে।

‘উপরেই ছাদ, দুপুরে তো ঘরটা গুমোট হয়ে যায়।’

‘আমার তেমন লাগে না। ঘরের দরজা জানালা সব বন্ধ করে দিই।’

‘একতলাটা খুব ঠাণ্ডা। বাইরের ঘরটায় চাঁদু দুপুরে নিশ্চয় খুব আরামেই কাটায়।’

চাঁদু নামটা শুনেই সরলা তটস্থ হল। দুপুরে ‘চাঁদু কি করছে’ শুনেই সে ধরে নিয়েছিল লোকেশ আর স্বাভাবিক থাকতে পারবে না।

‘তোমার হঠাৎ যে মাথা ধরল? আগে কখনো ধরেছে বলে তো জানি না।’ জাঙ্গিয়া পরা লোকেশ পিছন ফিরে পাজামা গলাচ্ছে। সরলা মুখটা দেখতে পেল না।

‘কি জানি, কেন যে ধরল। আগে তো কখনো-’ সরলা আর কথা খুঁজে পেল না।

‘দুপুরে বাইরের ঘরে গিয়ে তো থাকতে পার। অসুবিধে কি?’

‘নীচে চাঁদু থাকে।’

‘ওহ্ হ্যাঁ’

চাঁদু দরজায় এসে দাঁড়াল। 'চা দিয়েছি।'

'হ্যাঁ যাচ্ছি', লোকেশ অ্যাটাচি খুলে ছোট্ট ডায়েরী বইটা আর ডট পেন নিয়ে খাবার ঘরে গেল।

সরলা তাকে অনুসরণ করতে গিয়েও থমকে গেল। কি যেন একটা ভয়, যা গত আঠারো বছর তার মধ্যে ছিল না, এখন সে অনুভব করছে। এই প্রথম সে নিজেকে অনিরাপদ ভাবল। ধীরে ধীরে সে খাটের উপর বসল।

একটু পরেই লোকেশ ঘরে এল ডায়েরি আর কলমটা যথাস্থানে রাখার জন্য। সরলাকে বসে থাকতে দেখে বলল, 'মাথা এখনো ধরে আছে নাকি?'

'কি লিখে রাখলে?' সরলা ধীর স্বরে বলল।

'চাঁদুর দেশের ঠিকনাটা। তিন কপি পাসপোর্ট ফোটোও কাল দোকানে গিয়ে তোলাতে বলেছি, থানায় দিয়ে রাখতে হবে।' লোকেশ ব্যস্ত জরুরীভাবে কথাগুলো বলেই স্নান করতে গেল। সে শুনতে পেল না সরলার কথাগুলো- 'ও যে ছোট বেলা থেকে আমাদের বাড়িতে রয়েছে।'

পরের দিন সরলা দত্ত খুন সম্পর্কে আরও খবর দিল ওই বাংলা কাগজটি।

রঞ্জনাই সরলাকে ডেকে পড়তে দিল। দেবার আগে বলল, 'আমার যা মনে হয়েছিল সেটাই লিখেছে।'

সন্দেহ : ভৃত্যের সঙ্গে প্রণয়ে লিপ্ত ছিলেন গৃহবধূ।

হেডিংটা দেখেই সরলা পাথর হয়ে গেল। যখন সাড় ফিরে এল, তার মাথায় বিদ্যুৎ ঝিলিকের মত তীক্ষ্ণ একটা যন্ত্রণা খোঁচা দিতে শুরু করল। দৃষ্টি ঝাপসা হয়েই আবার ফিরে আসছে। রেলিং দু'হাতে আঁকড়ে সে নিজেকে দাঁড় করিয়ে রাখল।

'কি হল তোর? এই সরলা, অমন করছিস কেন?' রঞ্জনা ভীত ব্যাকুল স্বরে চেঁচিয়ে উঠল। রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে একটি লোক মুখ তুলে তাকাল।

সরলা ফিকে হাসল। 'কিছু হয়নি। যেভাবে লিখেছে প্রথম লাইনটা– পুলিশের সন্দেহ, মৃতা ও ধর্ষিতা ঘরের বৌ সরলা দত্ত ও তাদের গৃহভৃত্যের মধ্যে অবৈধ প্রণয় সম্পর্ক ছিল, পড়েই শরীরটা কিরকম গুলিয়ে উঠেছিল। আর পড়ার ইচ্ছে নেই আমার।' হাত বাড়িয়ে সে কাগজটা ফিরিয়ে দিল রঞ্জনাকে।

'তা তো হবেই, নিজের নামে ওই রকম একটা নোংরা খবর দেখলে– আমার নামে বেরোলেও আমারও গা গুলিয়ে উঠত। তুইতো ভেতরের লেখা আর পড়লি না। পুলিশের সন্দেহটা কেন হয়েছে জানিস, ওর স্বামীই বলেছে, অনেক বার চাকরটাকে ছাড়িয়ে দিতে চেয়েছিল কিন্তু বৌ ভীষণ আপত্তি করে নাওয়া খাওয়া বন্ধ করে দিত।

একদিন কোন এক মন্ত্রী মারা যাওয়ায় অফিস হাফ ছুটি হয়ে যায়। ভদ্রলোক বাড়ি চলে এসে দেখেন বৌ বিছানায় শুয়ে আর চাকরটা মাথা টিপে দিচ্ছে, ভদ্রলোক চাকরটাকে চড় মারেন, বৌকে ধমকান। তাইতে চাকরটা চোটপাট করে ওর সঙ্গে কথা বলে, খুন করবে বলেও ভয় দেখায়। তক্ষুণি উনি চাকরটাকে বিদায় করে দেন। তাইতে বৌ নাকি গলায় দড়ি দিতে গেছেল, ছেলে দেখতে পেয়ে মাকে ধরে থামায়। কি ঘেন্নার কথা। বোঝ এত কাণ্ড তলায় তলায় হয়েছে। অথচ কাল প্রতিবেশীরা কত গুণগানই না করল রিপোর্টারের কাছে। অবশ্য তাদেরইবা কি দোষ, বাইরে থেকে যেমন যেমন দেখেছে সেই মতই বলেছে। আমার ঘরে কি হয় না হয় তুই কি তা বলতে পারবি?'

সরলা চুপ করে শুনে গেল। বলার মত কথা তার নেই। তার মনে হচ্ছে আজ দুপুরেও লোকেশ অফিস থেকে ফোন করবে। জিজ্ঞাসা করবে, চাঁদু কি করছে।

তার অনুমান মত সত্যিই লোকেশের ফোন এল।

'আজও মাথাটা ধরেছে নাকি?'

‘না’। তারপরই সরলা বলল, ‘কি ব্যাপার তুমি দুপুরে ফোন করছ যে? কাল করলে, আবার আজও।’

‘এমনই, কেন করা নিষেধ নাকি? আঠারো বছর বিয়ে হলেই কি প্রেম-ট্রেম শুকিয়ে যাবে?’

‘প্রেমালাপ করার জন্য দুপুরে অফিস থেকে ফোন।’

‘দুপুরই তো প্রেমের সময়।’

‘গৃহবধূকে খুনেরও সময়।’ কথাটা মনের অগোচরেই সরলার মুখ থেকে বেরিয়ে এল। ওধার থেকে সঙ্গে সঙ্গে জবাব এল না।

দুজনেই ফোন কানে ধরে চুপ। অবশেষে নীরবতা ভাঙল লোকেশ। ‘পরে তোমার সঙ্গে কথা বলব।’ সে ফোন রেখে দিল।

বিকেলে ফোন বেজে উঠতে সরলা ধরল।

‘হ্যালো কে বলছেন?’ এক মহিলার গলা।

সরলার মনে হল চেনা চেনা, ‘আপনি কে বলছেন?

‘আমি সরলা দত্তকে চাই, আমার নাম মালবিকা।’

‘মলি! হতচ্ছড়ি, মুখপুড়ি, এতকাল কোথায় ছিলি?’

সরলা উত্তেজিত হয়ে চিৎকার করল। ‘কোথা থেকে ফোন করছিস? এত বছর হল একটা চিঠিও দিসনি। বাপের বাড়ি আসিস আর আমার সঙ্গে একবারটি দেখাও করিস না, তুই তো ইমফলে ছিলি এখন কোথায়? বর ছেলে মেয়ে কেমন আছে?’

দাঁড়া দাঁড়া বাপু দাঁড়া। তুইতো কোশ্চেনের লিস্টি ধরিয়ে দিলি। একে, একে, আমি এখনো ইমফলেই, সেখান থেকেই ফোন করছি। কর্তার অফিস থেকে, অতএব পয়সা লাগবে না।

টেলিফোনের বড় সাহেব হওয়ার এই এক সুবিধে। আমরা সবাই খুব ভাল আছি। চার নম্বর এখন আমার পেটে যন্ত্রস্থ, আর দু’মাস পরেই প্রকাশিত হবে। হাসবি না কিন্তু, বাচ্চায় ঘরভরা দেখতে আমার ভাল লাগে, ওরও ভীষণ ভাল লাগে’

‘অসভ্যতার খবর দিতে ফোন করলি ?’

‘কেন তুই করিস না?’

‘না করে উপায় আছে, চাকরি চলে যাবে না তাহলে।’

‘মার কাছে শুনলাম, তোর চেহারাটা নাকি একই রকম আছে।’

‘ভালবাসেন তাই বলেছেন। একই রকম কি করে থাকে, বয়স বাড়ছে না? সরলার গলা সুখের চাপে প্রায় বসে গেল।

‘এই শরীরটা নিয়েই হয়েছে জ্বালা, সবাই এত নজর দেয়।’

‘আর আমার দিকে কর্তাটি ছাড়া একটা ছেলে ছোকরাও তাকায় না। যা ঢেপসি দিন দিন হচ্ছি। বেঁটে মানুষ তায় আবার মোটা। তোর ছেলে এখন কি পড়ছে ?

‘উচ্চ মাধ্যমিক, ক্লাস ইলেভেন।’

‘কর্তা অফিসে, ছেলে স্কুলে, করিস কি দুপুরে ?’

‘কি আর করব, খেয়েদেয়ে ঘুমোই। এখন আবার এক যন্ত্রণা জুটেছে, কে এক সরলা দত্ত দুপুরে খুন হয়ে

আমাকে ডুবিয়ে গেছে। হতভাগীর বাপ-মা আর রাখার নাম পেল না।'

একটু আগেই কলকাতার কাগজ পেলুম। খবরটা পড়েই তো চমকে উঠেছিলুম, আমাদের সরি নয়তো? তারপর স্বামীর নাম পড়ে বুঝলুম, না তুই নোস। মনটা শান্ত হল, তবু ভাবলুম একবার কথা বলে নিশ্চিন্ত হয়ে নিই।'

'নিশ্চিন্ত তো তুই হলি কিন্তু আমার যে প্রাণ যায়। সবার ভাবনা এখন আমাকে নিয়ে। আমাদের বাড়িতেও তো বত্রিশ তেত্রিশের চাঁদু নামে দিন-রাতের কাজের লোক রয়েছে। সবাই ধরে নিচ্ছে ওর সঙ্গে আমার কিছু আছে আর আমিও খুন হবো। আশপাশের বাড়ি থেকে দুপুরে এমন অনেকেই খারাপ কিছু একটা দেখতে পাবে বলে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। কি যে নোংরা মন।'

'দিক উঁকি, তুই এসব গ্রাহ্য করবি না। লোকেশদা কিছু বলেছে নাকি ?'

'না' বলার পরই সরলা নিষ্প্রভ বোধ করল। লোকেশ মনে মনে যা বলে বা এখন বলছে তা অনেকটাই সে আঁচ করতে পারে। কিন্তু কাউকেই সেসব কথা বলা যায় না। সে সুখী এই ধারণাটা বড় বেশি ছড়িয়ে আছে।

'তবে আর কি। আসল খুঁটিটা শক্ত থাকলে তুই কোন কিছুরই পরোয়া করবি না। যে যা খুশি ভাবুক, মন খারাপ করবি না। আচ্ছা আমি এখন রাখছি, পরে একদিন ফোন করব, কেমন।'

মলির সঙ্গে কথা বলে সরলার খুব ভাল লাগছে নিজেকে। বিকেলে স্নান করে এসে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে তীক্ষ্ণ চোখে নিজেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। মলির মা তাকে মাস ছয়েক আগে দেখেছেন। ফিগারটা একই রকম আছে কিনা, নিজে সেটা বোঝা খুবই শক্ত। একটা ওজন মাপার যন্ত্র লোকেশ বছর দশ-বারো আগে কিনেছিল। হপ্তায় একদিন সবার ওজন নেওয়া হত। বরাবরই তার সাতন্ন বা আটান্ন কেজি হত। বরং লোকেশের ওজনই একটু একটু করে আশি কেজিতে পৌঁছে গেছল। তারপর যন্ত্রটার কি একটা খারাপ হল। সারাব সারাব করে লোকেশ আর সারায়নি।

তবু সরলার মনে হল, তার ওজন একই আছে। গলার কাছে চামড়া দু'আঙুলে চিমটি করে ধরে টানল এবং ছেড়ে দিল। ঢিলে হয়নি। বাহুতে এবং পেটেও তাই করল। দুই ঠোঁট প্রসারিত করে আলতো আঙুল বোলাল। চাররকম রঙের লিপস্টিক থেকে হালকা গোলাপিটা বেছে নিয়ে অধরে ঘষতে শুরু করল।

'বৌদি তোমার ছোড়দা এসেছেন'

সরলা প্রায় চমকে উঠে দরজায় তাকাল। 'সাড়া দিয়ে আসবি তো।' বিরক্তি চাপতে পারল না সে। 'কতবার বলেছি, তোর দাদা বলেছে'...

'কোথায় দাদা?'

'নিচে বাইরের ঘরে বসিয়েছি।'

'দাদা বাইরের লোক নয়, ডেকে নিয়ে আয়। লুচি ভাজ আর সত্যনারায়ণেও একবার যাবি। ঘরে একটাও মিষ্টি নেই'।

সনৎ চাকরি করে ইস্টার্ন রেলে। অফিস শেয়ালদায়। সেখান থেকেই আসছে। হাতের ঠোঙায় সাত আটটা আপেল আর সত্যনারায়ণ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার লেখা কাগজের বাক্স।

'বেশিক্ষণ বসব না রে। নাদুর জ্বর, কাল রাতে একশো তিন উঠেছিল, নানুর উইকলি পরীক্ষা। ওকে নিয়ে একটু বসতে হবে। তুই আছিস কেমন? মা বলল কেমন আছিস টাছিস জেনে আসতে।'

'ভালই আছি। একদিন মাকে দেখতে যাব।'

'যাস, মার শরীরটা ভাল নয়। হাঁপানির টানটা ইদানীং বেড়েছে।'

সনৎ দু'হাত পিছন দিকে বিছানায় রেখে মুখ তুলে পাখার হাওয়া লাগাতে লাগল। 'ট্রাম বাসের যা অবস্থা, লোকেশ তো মোটরেই যাতায়াত করে।'

‘হ্যাঁ।’

ট্রেতে চা নিয়ে চাঁদু ঘরে ঢুকল। সনৎ দ্রুত সোজা হয়ে কৌতূহল ভরে ওর দিকে তাকাল। সরলার মনে হল, ছোড়দা যেন গ্রহান্তরের কোন জীবকে দেখছে। চাঁদু বেরিয়ে যেতেই সনৎ জিজ্ঞাসা করল, ‘কত বছর হল ওর?’

‘অনেক বছর।’ দায়সারা উত্তর দিল। সে বুঝে গেছে হঠাৎ কেন ছোড়দার আবির্ভাব ঘটেছে।

‘বয়স তো হয়েছে, বিয়ে থা করবে না?’

‘কি জানি।’

‘এখানেই সারাজীবন পড়ে থাকবে?’

‘থাকলে থাকবে।’ সরলার বিশ্রী লাগছে তার দাদাকে। একটা নীচ সন্দেহের গন্ধ সে কথার মধ্যে পাচ্ছে।

সনৎ কথা না বলে চা খেতে লাগল। সরলা লুচি করতে বলেছিল দাদার জন্যই। যখন সনৎ উঠে দাঁড়াল, সে তাকে খেয়ে যাবার জন্য বলল না।

‘তাহলে একদিন তুই আসছিস।’

‘হ্যাঁ।’

‘চাঁদুকে কোথাও কাজকম্মো খুঁজে নিতে বল। লোকেশওতো পারে একটা কিছু জুটিয়ে দিতে।’

‘তা হয়তো পারে।’ রাগে সরলা ঠোঁট কামড়ে ধরল। ‘কিন্তু তুমি আবার ওকে নিয়ে ভাবতে বসলে কেন!’

‘না, এমনি। একটা জোয়ান ছেলে সামান্য একটা চাকরের কাজ করে জীবন নষ্ট করছে দেখলে কি রকম যেন লাগে। তাহলে আসছিস একদিন।’

সরলা অপেক্ষা করতে লাগল লোকেশের ‘পরে কথা বলব’ শোনার জন্য। লোকেশ ফিরল অন্যান্য দিনের মতই মুখ নিয়ে। সরলা কোনরকম থমথমানি বা উত্তেজনা দেখতে পেল না। বিটুর সঙ্গে কথা বলল, টিভি দেখল, চাঁদুকে বকুনি দিল। রাত পর্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই কেটে গেল। আলো নিভিয়ে বিছানায় শুয়ে কিছুক্ষণ এপাশ ওপাশ করে সরলাই বলল, ‘ফোনে দুপুরে বললে পরে কথা বলব। কি কথা বলবে?’

লোকেশ জবাব দিল না। দু’জনই পাশাপাশি চিৎ হয়ে শুয়ে। অবশেষে লোকেশ বলল, ‘তুমি কি সুখী?’

সরলাকে অশ্চর্য করল কথাটা। আঠারো বছরে এই প্রথম লোকেশ এমন সরাসরি, নিরাসক্ত স্বরে জানতে চাইল, জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটা। কারণটা কি? তার সুখের খবরে হঠাৎ ওর দরকার পড়ল কেন?

‘এতদিন পরে জানতে চাইছ যে?’

‘নানা, এমনিই, বিশেষ কিছু ভেবে নয়।’

সরলা কয়েক সেকেন্ড পর বলল, ‘হ্যাঁ আমি সুখী।’

লোকেশের দেহ মুহূর্তের জন্য শক্ত হল। এটা সরলা অনুভব করল ছুঁয়ে থাকা বাহু মারফৎ।

‘আর একটা কথা।’ লোকেশের গলা ক্ষীণ, যেন ইতস্তত করল।

‘কি কথা?’

‘তুমি কি আমায় ভালবাস?’

সরলা নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারল না।

কথাটা সে ঠিকই শুনেছে কিন্তু আঠারো বছরের স্বামীর মুখ থেকে শুনলে মনে হয় অন্য কেউ বলছে। সে হেসে উঠল।

‘জিজ্ঞাসা করার কি আছে, বুঝতে পার না?’

‘আমি স্পষ্ট শুনতে চাই তোমার মুখ থেকে।’

‘এত বছর পর তোমার খেয়াল হল?’

‘খেয়াল ঠিক নয়, বরাবরই আমার ইচ্ছে হয়েছে জানতে।’

‘ভালবাসার ধরন ধারণ তো এক এক বয়সে এক একরকম হয়।’

‘তোমার এই বয়সের ভালবাসা?’

‘হ্যাঁ, তোমাকে ভালবাসি।’

লোকেশ নীরব রইল। সরলা জিজ্ঞাসা করল, ‘আর কিছু জানতে চাও?’

‘চাঁদুকে ছাড়িয়ে দেব, তুমি কিন্তু না বলো না।’

সরলার মনে হল তার আসল খুঁটিটা হেলে গেছে। এখন তার সোজা হয়ে দাঁড়াবার কোন অবলম্বন আর নেই। লোকেশের শেষ কথাটা ‘তুমি কিন্তু না বলো না-র মধ্য দিয়ে জানা হয়ে গেল ওর মনের মধ্যে তার সম্পর্কে কি বিপজ্জনক ধারণা তৈরি হয়ে রয়েছে।

‘বোলপুরে আমাদের এক ডিলারের দোকানে ওর ব্যবস্থা করে দেব। এখানের চেয়ে বেশি মাইনে পাবে।’

সরলা মনে মনে বীভৎস একটা চিৎকার করল। একটা প্রচণ্ড লাথি মনে মনে কষাল, একদলা থুথু মনে মনে ছুঁড়ে দিল এবং মনে মনে বলল, ঘেন্না করি, ঘেন্না করি– সবই লোকেশের উদ্দেশ্যে।

সন্ধ্যায় তপু এসেছিল সঙ্গে সোমনাথ। যে ফ্ল্যাটটা ওরা দেখতে গেছল সেটাই ভাড়া নিচ্ছে। এবার ওরা বিয়ে করবে এই মাসেরই এগারো তারিখে, আর মাত্র চারদিন বাকি। রেজিস্ট্রি হবে ওদেরই এক বন্ধুর বাড়িতে। বেলেঘাটায়। সোমনাথ কাগজে নকসা এঁকে বুঝিয়ে দিয়েছে, কত নম্বর বাসে কোথায় নামতে হবে বা টাক্সিতে কত ভাড়া পড়বে।

‘সরলাদি জামাই বাবুকে বলব?’ তপু আগ্রহ নিয়ে বলেছিল।

‘বলে লাভ নেই’ সরলা অম্লানবদনে মিথ্যা কথা বলে।

‘দশ তারিখে উনি ভুবনেশ্বর যাবেন, তারপর আরও কতকগুলো জায়গায়। আমি একাই যাব।’

‘ঠিক সাতটায়। তুমি কিন্তু একজন উইটনেস/লোকজন বেশি হবে না, জনাদশেক বড়জোর।’

‘ভাবিসনি, যাব বলেছি যাব।’

ফার্নিচারের দোকানে যাবার তাড়া ছিল তাই ওরা আধঘণ্টার বেশি থাকেনি। চাঁদু চা-এর কথা বলেছিল, ওরা খায়নি। যেমন হুরমুড়িয়ে আসা তেমনিভাবেই যাওয়া। সরলা আলমারির লকার খুলে গহনার বাক্স বার করে তার তিনটি আংটির থেকে বেছে নিয়ে আঙুলে পড়ল। তপুকে বিয়ের পর এটা সে দেবে।

অফিস থেকে ফিরে জুতো খুলতে খুলতে লোকেশ বলল, ‘একজনের কথা বলল আমাদের বেয়ারা। মুর্শিদাবাদে ওদেরই গ্রামের মেয়ে, স্বামী নিরুদ্দেশ। নিউ আলিপুরে এক উকিলের বাড়িতে বছর দুই কাজ করছে। শ’তিনেক পায়। আটটা লোকের সংসারে সব কাজই করে। স্বভাব-টভাব ভাল। আমি বলেছি আমরা মাত্র তিনজন, ওই টাকাই দেব, নিয়ে এস তাড়াতাড়ি। দেরি করলে ওদিকে বোলপুরটাও হাত ছাড়া হয়ে যাবে। বলেছে তো কাল পরশু যাবে।’

সরলা চুপ করে শুনে গেল। কথা বলতে বলতে লোকেশ মুখ তুলে তাকাচ্ছিল। লক্ষ্য করছিল তার কথা শুনে সরলার প্রতিক্রিয়াটা কেমন হয়। কিছুই হতে না দেখে সে বিরক্ত হয়ে বলল, ‘তোমার কি পছন্দ হচ্ছে না?’

‘কেন হবে না’।

লোকেশ যখন খেতে বসেছে সরলা তখন বলল, ‘তপু এসেছিল। ওর বিয়ে।’

খাওয়া থামিয়ে লোকেশ তাকিয়ে রইল ‘কি বললে?’

‘তপু বিয়ে করছে। আগে যে ব্রাঞ্চে কাজ করত সেখানকার একটি ছেলেকে।

‘কবে?’

‘এই তো এগারোই। বেলেঘাটায় ওদের এক বন্ধুর বাড়িতে, সন্ধ্যা সাতটায়। আমি উইটনেস হব।’

‘তুমি! এই বিয়েতে?’

‘কেন, কি হয়েছে যদি সাক্ষী থাকি?’

‘না।’

‘কেন?’

‘কৈফিয়ৎ দিতে পারব না। একটা পুরুষকে ভোগ করে তৃপ্তি হয়নি, এখন আর একটা।’ কথাটা বলে লোকেশ দরজার বাইরে তাকাল।

ছলাৎ করে সরলার মাথায় রক্ত উঠে এল। সে দাঁতে দাঁত চেপে বলল, ‘এ কথা বলার মানে? আমি জানি কাকে উদ্দেশ্য করে এ কথা বললে।’

‘জান তো ভালই।’

‘তোমার মন অত্যন্ত নোংরা। আজ নয়, বিয়ের পর থেকেই দেখেছি তুমি আমাকে সন্দেহ কর। কেন?’

লোকেশ মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, ‘সন্দেহ করি না ভয় পাই। তোমার ওই শরীরটাকে খুব ধারালো লাগে।’

‘বাজে ন্যাকামো রাখো। ষোলআনা সুখ তুমি আমাকে কোনদিনই পেতে দাওনি। বরাবরই তুমি চাঁদু আর আমাকে নিয়ে নোংরা চিন্তা করেছ।’

লোকেশ ছিলে ছেঁড়া ধনুকের মতো ছিটকে উঠল। ‘মুখ সামলে। আর একটা কথা বলেছ কি-’

‘কি করবে তুমি, মারবে?’

লোকেশ টেবল থেকে উঠে গেল এবং কিছুক্ষণ পর নেমে গেল একতলার বসার ঘরে। তিনটি দিন ওরা নেহাত দরকারী কথা ছাড়া পরস্পরের সঙ্গে কথাই বলল না। সরলা রাত্রে বিটুর ঘরে শুয়েছে। বিটু এখন বন্ধুদের সঙ্গে দার্জিলিং বেড়াতে গেছে।

এগারো তারিখে তপুর বিয়ের দিন, লোকেশ যখন অফিস বেরোচ্ছে সরলা তাকে বলল, ‘আজ তপুর বিয়ে, আমি যাব।’

লোকেশ একবার ওর মুখের দিকে তাকিয়েই বেরিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু পরের কথা শুনেই থমকে গেল।

‘চাঁদুকে সঙ্গে নিয়ে যাব।’

উপেক্ষা, ঔদ্ধত্য, অস্বীকৃতি সরলার সর্বাঙ্গে। থুতনি তুলে সে লোকেশের দিকে তাকিয়ে। জ্বল জ্বল করছে চোখ।

চোয়ালটা একবার শক্ত করে লোকেশ মুখ দিয়ে শব্দ বের করল। যে শব্দের কোন অর্থ নেই।

লোকেশ অফিস থেকে ফিরল অসময়েই। তখন বিকেল পাঁচটা। সরলা এই নিয়ে কোন প্রশ্ন করল না, কৌতূহল দেখাল না। সে যেন জানতই লোকেশ তাড়াতাড়ি ফিরবে তার যাওয়া বন্ধ করতে। সে গা ধুয়ে মুখে প্রসাধনী

দিল। সযত্নে লিপস্টিক মাখাল ঠোঁটে। চুল বাঁধল। তারপর আলমারি থেকে একটা বেগুনি কাঞ্চি ভরম বার করল। বিছানায় চিৎ হয়ে কপালে দু'বাহু রেখে লোকেশ দেখে যাচ্ছে। তার সামনেই সরলা শাড়ি বদলাল। হাত ব্যাগটা খুলে ভিতরটা দেখল। ঘড়ি পড়ল। আংটিটা খুলে ব্যাগে রেখে আবার কি ভেবে আঙুলে পড়ল। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় গিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'চাঁদু তোর হল, ছ'টা বাজতে যাচ্ছে।'

নীচ থেকে চাঁদু কি একটা বলল।

'তাড়াতাড়ি কর, ট্যাক্সি ধরাও তো এক ঝকমারির কাজ।' ঘরে ফিরে এসেই দেখল লোকেশ উঠে বসেছে। চোখে কর্কশ চাহনি।

'তোমার সাহস দেখে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি।'

সরলা জবাব না দিয়ে আয়নায় নিজেকে দেখতে লাগল।

'এখনো বলছি তোমার যাওয়া হবে না।'

'কেন হবে না?'

'আমার পছন্দ নয়।' লোকেশ খাট থেকে নেমে দরজা বন্ধ করে ছিটকিনি তুলে দিল।

'একি! তুমি আমায় ঘরে আটকে রাখবে নাকি?'

লোকেশের পাশ দিয়ে সরলা দরজা খোলার জন্য যেতে গিয়ে বাধা পেল। সে ধাক্কা দিল লোকেশকে। কি ছেলেমানুষী।'

মুঠোয় সরলার চুল ধরে টেনে এনে তাকে খাটের উপর প্রায় ছুঁড়ে দিল লোকেশ।

'এ ঘর থেকে এক পাও বেরিয়েছ কি তোমার মোক্ষম শাস্তি দেব। এ বাড়িতে আর তা হলে ঢুকতে পারবে না। তোমার ছেলেকে বলব, তোর মা চাকরের সঙ্গে প্রেম করত। এক সঙ্গে ওদের আমি বিছানায় শুতে দেখেছি। ধরা পড়ে গিয়ে ভয়ে দু'জনই পালিয়েছে। পাড়ার লোকেদের, তোমার বাপের বাড়ির লোকেদেরও তাই বলব।' লোকেশ ধীর পায়ে গিয়ে ছিটকিনিটা নামাল। দরজা খুলে বেরিয়ে যাওয়ার আগে পিছন ফিরে তাকাল। সরলা বিস্ফারিত চোখে তার দিকে তাকিয়ে। দৃষ্টিতে কোন অর্থ নেই।

নিচে গিয়ে লোকেশ ডাকল চাঁদুকে। ধবধবে ধুতি পাঞ্জাবি আর চটি পরে সে তখন তৈরি।

'বৌদি যাবে না। ভীষণ মাথা ধরেছে। আর তুই কালই সকালে নটা পঞ্চান্নর শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেসে বোলপুর রওনা হবি। আজই আমাকে টেলিফোন করে বলেছে। কাল যদি তুই না যাস তাহলে অন্য লোক রাখবে। ছ'শো টাকা মাইনের কাজ জীবনে তুই পাবি?'

'দাদা আমার কিন্তু এখানেই-'

'কাল আটটার মধ্যে রওনা হবি। তারপর আর যেন তোকে এ বাড়িতে না দেখি। জামা কাপড় খুলে ফ্যাল। এক কাপ চা করে দে।'

লোকেশ ধীর পায়ে সিঁড়ির দিকে এগোল। ফ্যালফ্যাল করে চাঁদু তাকিয়ে। দোতলায় পৌঁছেই সে ফোন বাজার শব্দ পেল। দ্রুত গিয়ে রিসিভার তুলল।

'হ্যাঁ বলুন, সরলাদি? উনি এখন খুব অসুস্থ, মাথায় একটা যন্ত্রণা হচ্ছে বলে... হ্যাঁ ওহ্ তপু তুমি!'

'আপনি কলকাতায় থাকবেন না বলেছিলেন সরলাদি। নইলে আপনাকেও নিমন্ত্রণ করতাম। আজই তো আমার বিয়ে। রেজিস্ট্রি।

কনগ্রাচুলেশনস, খুব ভাল খবর। অবশ্যই বিয়েতে যেতাম। কিন্তু এমনি দুর্ভোগ বাইরেও যেতে পারলাম না তোমার সরলাদির জন্য। কি যে এক মাথার অসুখ বাঁধিয়েছে।'

সরলাদি সাক্ষী থাকবেন বলেছিলেন, তাই ওকে আবার মনে করিয়ে দিতে ফোন করছি। অবশ্য সাক্ষী হবার মতো লোক আছে, তবু আমার নিজের দিকের কেউ থাকলে খুব ভাল লাগত। আচ্ছা রাখছি, আমি যাব একদিন।'

'নিশ্চয় আসবে।'

ফোন রেখে লোকেশ ফিরে তাকাল। সরলা একইভাবে খাটে পড়ে রয়েছে।

বারান্দায় সরলা দাঁড়িয়ে। এখন কলে জল আসার সময়, দু'টি ঝি কাজে যাচ্ছে। সরলা চেঁচিয়ে বলল, 'হ্যাঁ গো আমাদের বাড়ি কাজ করবে? দাঁড়াও না, কাজ করবে? শোনই না, কথা কানে নাও না কেন বল তো?

ঝি দু'জন দাঁড়াল না। শুধু একজন অপরজনকে বলল, বৌটার মাথা খারাপ, ছ'মাসে পাঁচটা বাসন মাজার লোক কাজ করেছে। এ বাড়িতে লোক টেকে না।

For More Books & Muzic Visit www.MurchOna.com

suman_ahm@yahoo.com